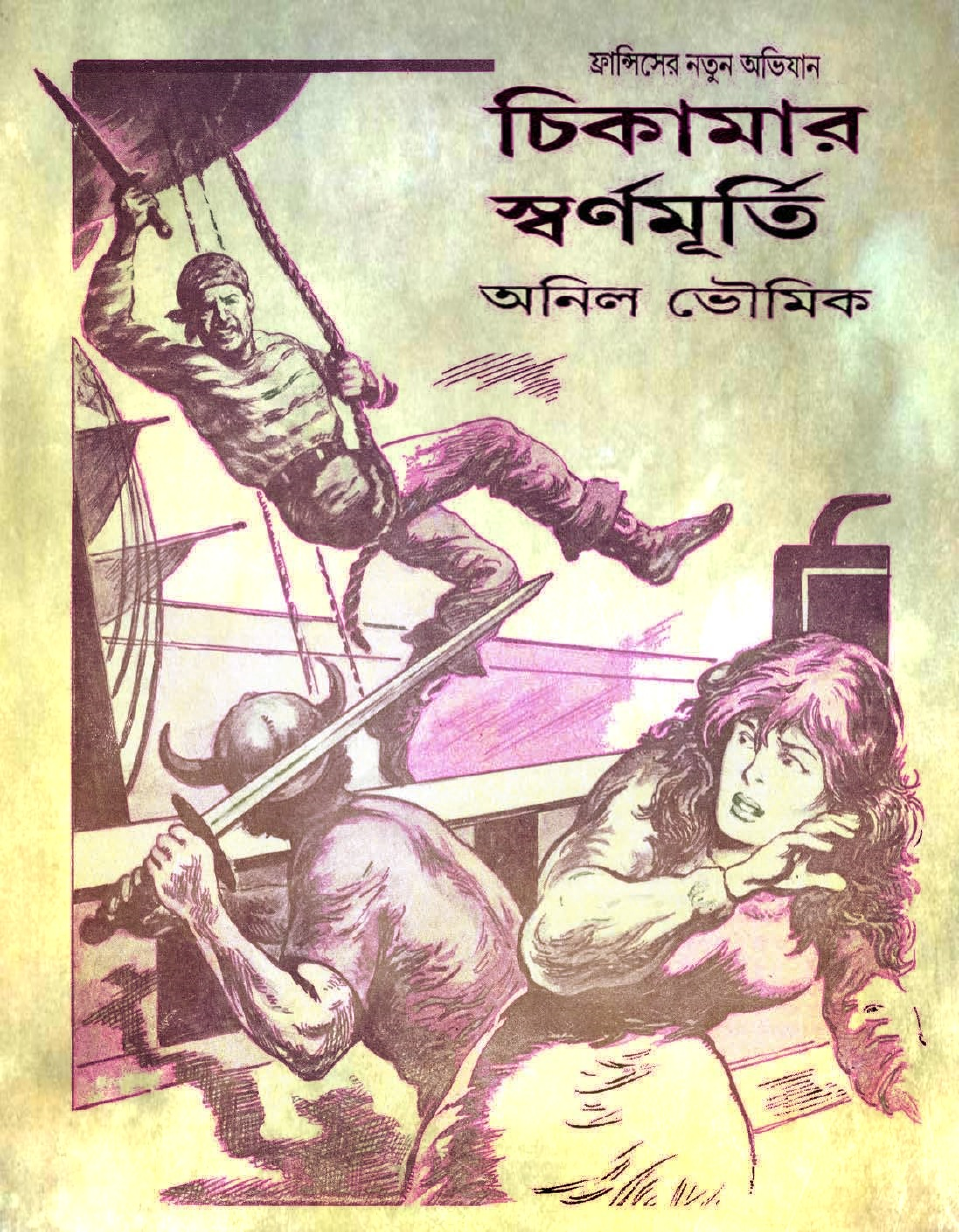


ফ্রান্সিসের নতুন অভিযান
চিকামার স্বর্ণমূর্তি
অনিল ভৌমিক

প্রথম প্রকাশ

শুকতারা

শারদীয়া ১৩৯৮

প্রযোজনা

খেলাধুলা

পরিকল্পনা ঃ সুজিত কুন্ডু

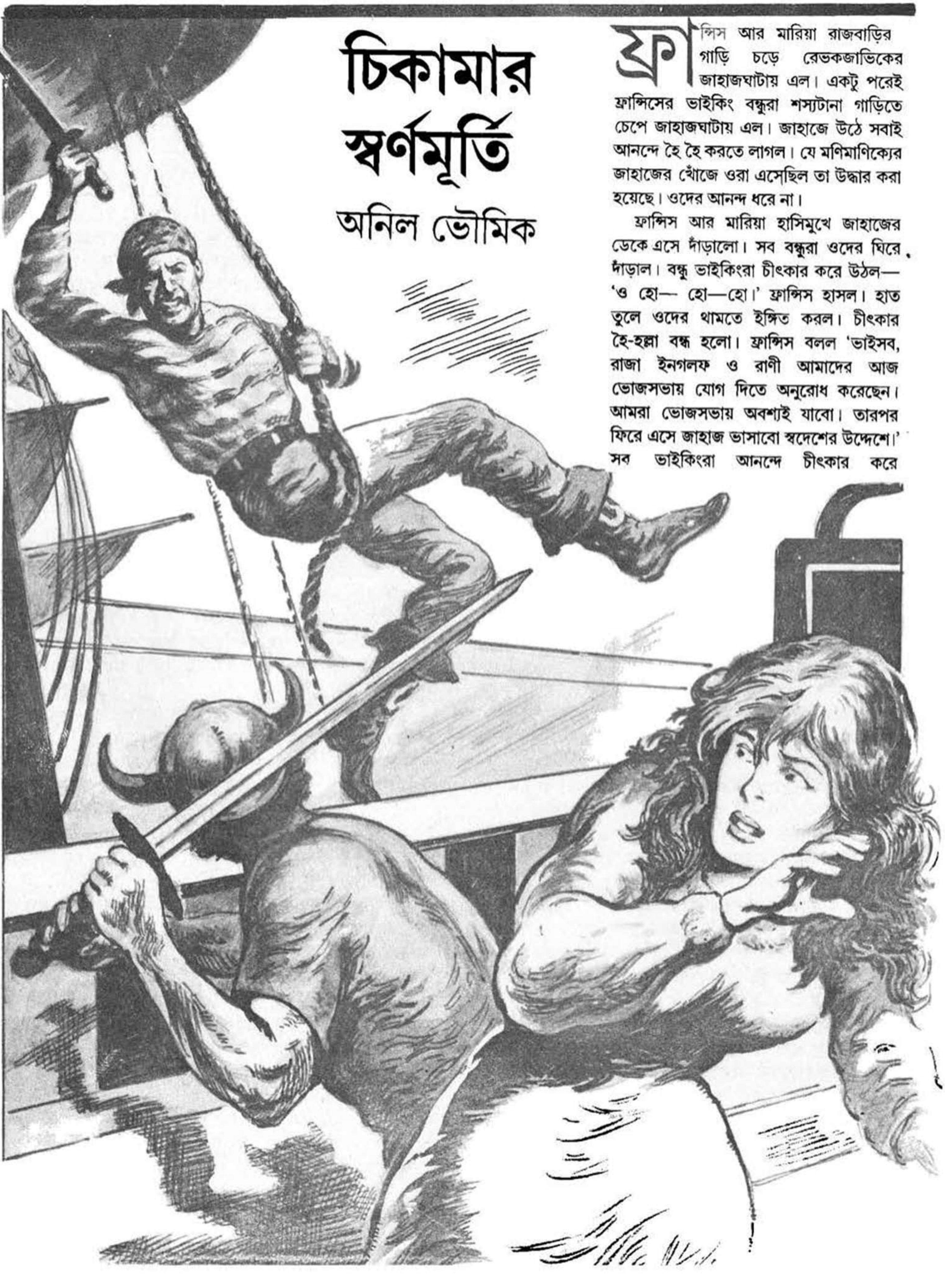
রূপায়ন ঃস্নেহময় বিশ্বাস

চিকামার স্বর্ণমূর্তি

অনিল ভৌমিক

ফ্রান্সিস আর মারিয়া রাজবাড়ির গাড়ি চড়ে রেভকজাভিকের জাহাজঘাটায় এল। একটু পরেই ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা শস্যটানা গাড়িতে চেপে জাহাজঘাটায় এল। জাহাজে উঠে সবাই আনন্দে হৈ হৈ করতে লাগল। যে মণিমাণিক্যের জাহাজের খোঁজে ওরা এসেছিল তা উদ্ধার করা হয়েছে। ওদের আনন্দ ধরে না।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া হাসিমুখে জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালো। সব বন্ধুরা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। বন্ধু ভাইকিংরা চীৎকার করে উঠল—'ও হো— হো—হো।' ফ্রান্সিস হাসল। হাত তুলে ওদের থামতে ইঙ্গিত করল। চীৎকার হৈ-হল্লা বন্ধ হলো। ফ্রান্সিস বলল 'ভাইসব, রাজা ইনগলফ ও রাণী আমাদের আজ ভোজসভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেছেন। আমরা ভোজসভায় অবশ্যই যাবো। তারপর ফিরে এসে জাহাজ ভাসাবো স্বদেশের উদ্দেশে।' সব ভাইকিংরা আনন্দে চীৎকার করে



উঠল—'ও-হো-হো।' এবার সবাই ভোজসভায় যাবে বলে পোশাক পরে তৈরি হতে গেল।

ক' ঘণ্টা পরে ভাইকিংরা ভোজসভার শেষে জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস ও মারিয়া রাজা ইনগলফের বিশেষ অতিথি হিসেবে গিয়েছিল। ওরাও রাজবাড়ির গাড়িতে ফিরে এল। ফ্রান্সিস জাহাজ ছাড়ার ইঙ্গিত করল। ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে জাহাজের নোঙর তোলা হলো, বাতাসের তেমন জোর নেই। দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে চলে গেল। সমুদ্রের জলে দাঁড় চালাবার শব্দ উঠল, ছপ্‌ ছপ্‌। সব কটা পাল খাটানো হলো। পালে হাওয়া লাগল। জাহাজটা আস্তে আস্তে রেভকজাভিক বন্দর ছেড়ে মহাসমুদ্রের দিকে চলল।

দিনকয়েক পরেই জাহাজ দিনরাতের অঞ্চলে চলে এল। শীতের তীব্রতা কমে গেল। সবাই বাড়তি গরম পোশাক খুলে ফেলল। জাহাজ চলল ভাইকিংদের দেশের দিকে।

সেদিন দুপুরবেলা। জোর হাওয়ায় জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠেছে। আকাশও পরিষ্কার। দাঁড়টানার কাজ থেকে ছুটি। ভাইকিংরা বেশিরভাগই নিজেদের কেবিনে শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে। অনেকে ঘুমিয়েও নিচ্ছে। জাহাজের ডেকের নিস্তেজ রোদে কয়েকজন ভাইকিং কম্বল পেতে শুয়ে আছে। ওদের মধ্যে বিস্কোও আছে। হঠাৎ মাস্তুলের মাথায়-বসা নজরদার নিচে ডেকের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—'একটা জাহাজ এইদিকে আসছে।'

—'কোন দেশের জাহাজ?' শুয়ে থাকা বিস্কো চেঁচিয়ে বলল।

—'মাস্তুলে একটা পতাকা উড়ছে—ঠিক ঠাহর করতে পারছি না কোন দেশের পতাকা।' নজরদার বলল।

—'মরুক গে,' বিস্কো বলল—'দেখো জলদস্যুদের জাহাজ যেন না হয়।'

একটু সময় গেল। সেই জাহাজটা তখন বেশ কাছে চলে এসেছে। নজরদার এতক্ষণে জাহাজটার পতাকা ভালোভাবে দেখতে পেল। স্পেনদেশের পতাকা। নজরদার নিশ্চিন্ত হলো। নজরদার চেঁচিয়ে বলল—'স্পেন দেশের জাহাজ।'

বিস্কো শুয়ে শুয়েই বলল—'ঠিক আছে।'

জাহাজটা তখন ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ের কাছে পাশে পাশেই চলেছে। হঠাৎ নজরদার দেখল সেই জাহাজের মাস্তুল থেকে স্পেনদেশের পতাকা নামিয়ে ফেলা হলো। সেখানে ওড়ানো হলো কালো কাপড়ে সাদা মড়ার মাথা আর ট্যাড়া আঁকা জলদস্যুদের পতাকা। নজরদারের বুক কেঁপে উঠল—জলদস্যুদের জাহাজ। ও চীৎকার করে উঠল—'জলদস্যু।' কিন্তু ওর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। যেটুকু শব্দ গলা দিয়ে বেরুলো তা কারো কানেই গেল না। ততক্ষণে জলদস্যুদের জাহাজটা ভাইকিংদের জাহাজের গায়ে এসে লেগেছে। কোনোরকম শব্দ না করে জলদস্যুরা খোলা তরোয়াল উঁচিয়ে এই জাহাজে উঠতে লাগল। প্রথমে উঠল জলদস্যুদের দলপতি। ছুঁচোলো দাড়ি গোঁফ মুখে। মাথায় বাঁকা কালো টুপি। গায়ে জমকালো পোশাক। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বুট। জলদস্যুদের ইয়া গোঁফ, গাল পর্যন্ত জুলপি, মাথায় ঝাঁকড়া চুলে লাল কাপড়ের ফেট্টি, গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি।

নজরদার দ্রুত মাস্তুলের গায়ে লাগানো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল— 'জলদস্যু—সাবধান!' ও কথাটা একবারই বলতে পারল। জলদস্যুর দলপতি কোমরের বেল্টে গোঁজা লম্বা ছুরিটা বের করে ছুঁড়ল নজরদারের দিকে। ছুরিটা পাক খেয়ে ছুটে গিয়ে নজরদারের বুকে বিঁধে গেল। ও দড়ির সিঁড়ি থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিঁধে যাওয়া ছুরিটা ধরে টানতে গেল। ছুরিটা বুক থেকে বের করতে পারল না। ছিটকে পড়ল জাহাজের রেলিং-এর ওপর। তারপর পাক খেয়ে সমুদ্রের জলে।



ততক্ষণে যে চারজন ভাইকিং ডেকে কম্বল পেতে শুয়ে ছিল তাদের দু'জনের বুকেও জলদস্যুরা তরোয়াল বিঁধিয়ে দিয়েছে। ওরা টুঁ শব্দটিও করতে পারল না। বিপদ আঁচ করে বিস্কো দ্রুত উঠে পড়ল। দেখল উদ্যত তরোয়াল হাতে জলদস্যুরা ওদের ঘিরে ধরেছে। জলদস্যুদের দলপতি এগিয়ে এসে হাতের তরবারির ডগাটা বিস্কোর বুকে ঠেকিয়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল—'কোনোরকম শব্দ করবে না। চলো তোমাদের অস্ত্রঘরটা দেখিয়ে দাও।' ততক্ষণে অন্য ভাইকিংটির মাথায় একজন জলদস্যু তরোয়ালের বাঁট দিয়ে ঘা মেরেছে। ভাইকিংটি দু'হাতে মাথা চেপে ডেকের ওপর গড়িয়ে পড়ে গেল।

এবার বিস্কোর পিঠে জলদস্যুদের দলপতি তরোয়ালের ডগা ঠেকিয়ে বলল—'চলো।'

বিস্কো দাঁড়িয়েই রইল। ও তখন ভাবছে কী করে ফ্রান্সিস ও হ্যারিকে এই বিপদের কথা জানাবে। ওর পিঠে তরোয়ালের চাপ বাড়িয়ে দস্যু দলপতি বলল —'চলো,নাহলে তরোয়াল বিঁধিয়ে দেব।' বিস্কো বুঝল এখন এদের কথামতো চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। রুখে দাঁড়ালে ওকে ঠিক হত্যা করবে। বিস্কো আস্তে আস্তে চলল। সিঁড়ি বেয়ে ওরা নামতে যাবে দলপতি চাপাস্বরে বলল—'কোনো শব্দ যেন না হয়।'

বিস্কো সামনে, পেছনে দস্যু দলপতি ও অন্য দস্যুরা নামতে লাগল। বিস্কো ওদের অস্ত্রঘরের সামনে নিয়ে এল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—'অস্ত্রঘর।' দলপতির নির্দেশে দু'জন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। জলদস্যুদের দলপতি বলল—'তোমাদের ক্যাপ্টেন কে? তার কাছে আমাকে নিয়ে চলো।' বিস্কো চিন্তায় পড়ল। যে করেই হোক সে ফ্রান্সিসকে মুক্ত রাখতে চাইল। যদি ফ্রান্সিস ধরা না পড়ে তাহলে ফ্রান্সিস বুদ্ধি খাটিয়ে নিশ্চয়ই বিপদ থেকে সকলকে উদ্ধার করতে পারবে। জলদস্যু নেতা ওর পিঠে তরোয়ালের চাপ বাড়াল। গম্ভীর গলায় বলল—'চলো। কোনোরকম চালাকি করেছো কি মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।'

বিস্কো চলল। পেছনে পেছনে জলদস্যু নেতা। ওর পেছনে চারজন খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যু। ঠিক তখনই একটা কেবিন ঘরের দরজা খুলে একজন ভাইকিং বেরিয়ে এল। পড়ল একেবারে বিস্কো আর জলদস্যুদের সামনে। বিস্কো বলে উঠল—'এই আমাদের ক্যাপ্টেন।'

জলদস্যু নেতা একলাফে সামনে গিয়ে ভাইকিংটির গলায় তরোয়াল ঠেকিয়ে বলল—'তুমিই এই জাহাজের ক্যাপ্টেন? ভাইকিংটির মুখ তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। দু'হাত ওপরে তুলে ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল—'না-না, আমি না ফ্রান্সিস।' বিস্কো চোখের ইঙ্গিতে ভাইকিং বন্ধুটিকে বোঝাল যেন ও বলে যে, ওই ক্যাপ্টেন। কিন্তু বন্ধুটি তো সেটা বুঝল না উল্টে ফ্রান্সিসের নাম বলে দিল।

জলদস্যু নেতা এবার রাগত দৃষ্টিতে বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল—'আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিলে।' একজন জলদস্যুর দিকে তাকিয়ে বলল—'একে ডেকে নিয়ে যাও। বন্দী কর।' এবার দলনেতা ভাইকিংটির দিকে তাকাল। বলল—'আমাকে ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে চলো। কোনোরকম চালাকি করবে না।' ভাইকিংটিকে সামনে রেখে জলদস্যুরা চলল।

সবাই ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিন ঘরের সামনে দাঁড়াল। ভাইকিংটি আঙুল দিয়ে দরজাটা দেখাল। দস্যুনেতা গলা নামিয়ে বলল—'ফ্রান্সিসকে ডাকো।' ভাইকিংটি দরজায় টোকা দিল। ডাকল—'ফ্রান্সিস-ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস তখন বিছানায় আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম করছিল। মারিয়া বিছানায় বসে রুমালে এমব্রয়ডারি করছিল। ডাক শুনে মারিয়া এসে দরজা খুলে দিল। জলদস্যু নেতা উদ্যত তরবারি হাতে এক ধাক্কায় দরজা সবটা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ফ্রান্সিস একলাফে বিছানা থেকে নেমে কাঠের দেয়ালে ঝোলানো তরোয়ালটার দিকে ছুটল। কিন্তু, তরোয়াল হাতে নেবার আগেই দু'জন জলদস্যু দুদিক থেকে ফ্রান্সিসকে জাপটে ধরল। ফ্রান্সিস শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। জলদস্যু দু'জনের তরোয়ালের খোঁচা লেগে ফ্রান্সিসের বুকে পিঠে হাতে কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। মারিয়া বুঝল ওরা সকলেই বিপদে পড়েছে। কিন্তু মারিয়া ভয় পেল না। দৃপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—'আপনি কে?' জলদস্যু-দলপতি একটু মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে হেসে বলল—'আমার নাম আলবার্তো।'

—'তুমি জলদস্যু।' মারিয়া চেঁচিয়ে বলল।

— 'হ্যাঁ', আলবার্তো বলল—'মাদ্রিদ নগরে পাঁচ একর জমি কিনেছি। বাড়ি হচ্ছে। সোনা রুপো হীরে অলঙ্কার এসব আমার এখন খুব প্রয়োজন। তাই জাহাজ লুঠ করি। আর একটা কাজও করতে হয়। ক্রীতদাস সংগ্রহ ও বিক্রি।

— 'ঠিক আছে', মারিয়া বলল— 'আমাদের যা সোনা রুপো অলঙ্কার আছে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের জাহাজ থেকে দূর হও তোমরা।'

—'খুব ভালো কথা। আপনি সেসব একত্র করুন। কিন্তু আপনাদের কাউকে তো ছাড়া হবে না। কাছাকাছি ডাঙায় যেখানে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট পাবো সেখানেই আপনাদের বিক্রি করে দেব। সাদা চামড়ার ক্রীতদাস, অনেক দাম পাওয়া যাবে।'

ফ্রান্সিসকে ততক্ষণে দু'জন জলদস্যু দুহাত বুক ঘাড় দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ফেলেছে। ফ্রান্সিস বাধা দেয়নি। ও বুঝতে পেরেছে—এখন লড়াই অসম্ভব। খালি হাতে এখন লড়াই চলবে না। সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। আলবার্তো জলদস্যু দু'জনকে ইঙ্গিত করল। ওরা ফ্রান্সিসকে ধরে নিয়ে চলল। পেছনে মারিয়া। মারিয়ার দু'টো হাতও ততক্ষণে বাঁধা হয়ে গেছে। সামনে আলবার্তো, পেছনে ফ্রান্সিসরা। সবাই চলল ডেকে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

ওদিকে জলদস্যুরা চেষ্টা করল যাতে নিঃশব্দে সব কাজ সারা যায়, কিন্তু পারল না। ওদের দ্রুত চলাফেরায় কাঠের পাটাতনে শব্দ হলো বেশ। দু'চারজন ভাইকিং কেবিন ঘর থেকে বেরিয়েও এল। জলদস্যুদের দেখল। অস্ত্রঘরের দিকে ছুটল অস্ত্র আনতে। গিয়ে দেখল অস্ত্রঘরের সামনে খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুরা পাহারা দিচ্ছে। ওরা হতাশ হলো। জলদস্যুরা ওদের ঘিরে ফেলল। ওদের হাত বেঁধে নিয়ে চলল ডেকে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি আর সব ভাইকিংদের জাহাজের ডেকে জলদস্যুরা জড়ো করল। আলবার্তো সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—'তোমরা সবাই বন্দী। শুধু—' আঙুল দিয়ে মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—'ইনি স্ত্রীলোক। ইনি থাকবেন একটি কেবিন ঘরে। সেই ঘরের দরজার সামনে অবশ্যই পাহারাদার থাকবে। একটা কাজ তাঁকে করতে হবে। এই জাহাজে সোনা-মুক্তো-হীরে যা কিছু দামী জিনিস আর অলঙ্কার আছে সব একত্র করে আমাকে দিতে হবে।'

—'যদি না দিই।' মারিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলল।

—'তাহলে আপনি এবং এই জাহাজের কেউ বেঁচে থাকবেন না। সবাইকে মেরে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলা হবে।' আলবার্তো বেশ জোরের সঙ্গে বলল। ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'মারিয়া—কোনো কথা বলো না।' ভাইকিংরা সবাই তখন রাগে ফুঁসছে। বিনা যুদ্ধে এভাবে হার স্বীকার করা ওদের সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু উপায় নেই। এ অবস্থায় খালি হাতে লড়া যাবে না। ওরা চুপ করে রইল।

আলবার্তো মারিয়ার সামনে এল। মারিয়ার

বাঁধা হাত খুলে দিল। বলল—'যান। এই জাহাজে যা কিছু সোনা দানা হীরে মুক্তো আছে সব নিয়ে আসুন।' একজন জলদস্যুর দিকে তাকিয়ে আলবার্তো বলল—'এঁর সঙ্গে যা। সব যোগাড় হলে এঁকে আমাদের ক্যারাভেল-এ নিয়ে যাবি। পাঁচ নম্বর কেবিন ঘরে বন্দী করে রাখবি। পাহারা দিবি।'

জলদস্যুটি খোলা তরোয়োল হাতে মারিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। মারিয়া তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আলবার্তো গলা চড়িয়ে হুকুমের সুরে বলল—'যান।' ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—'মারিয়া কথার অবাধ্য হয়ো না।' মারিয়া একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে এগোলো।

আলবার্তোর হুকুমে সব জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর ওদের ঠেলে নিয়ে চলল জাহাজের ডেকের পাশে কাঠের রেলিঙের দিকে। দু'টো জাহাজই তখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসদের একে একে জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজে নিয়ে আসা হলো। সিঁড়ি দিয়ে নিচে জাহাজের খোলে নামানো হলো। একটা লোহার শিক লাগানো দরজার সামনে ওদের আনা হলো। একজন পাহারাদার জলদস্যু দরজাটার তালা খুলল। দেখা গেল এই দিনের বেলায়ও প্রায় অন্ধকার কয়েদ ঘর। ফ্রান্সিসদের সবাইকে সেই ঘরে ঢোকানো হলো। তিনজন কয়েদ ঘরের পাহারাদার জলদস্যু ফ্রান্সিসদের প্রত্যেকের হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর লোহার মোটা শিকওয়ালা দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করল। তালা লাগাল। তারপর দরজার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল।

ভাইকিংরা কেউ কেউ কাঠের মেঝেয় শুয়ে পড়ল, কেউ কেউ বসে পড়ল। কেউ কেউ পায়চারি করতে লাগল। ফ্রান্সিস কাঠের দেয়ালে পিঠ চেপে বসল। পাশে বসল হ্যারি আর বিস্কো। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—আমাদের সাবধান থাকা উচিত ছিল। বিস্কো বলল—'ঈস্—নজরদার যদি একটু আগে বলতো—'

—'ওসব ভেবো—না আর—' ফ্রান্সিস বলল। একটু থেমে বলল—'চারদিক ভালো করে দেখেছি। দরজা ছাড়া আর কোথাও দিয়ে পালাবার উপায় নেই। তবে পা খোলা আছে আর শাঙ্কো বলেছে ওর বড় ছুরিটা ও জামার ভেতর লুকিয়ে রেখেছে। ক'টা দিন যাক। ওদের পাহারা দেওয়ার নিয়ম খাবার দেবার নিয়ম এসব দেখি। তারপর মুক্তির ফন্দী আঁটবো।' আর কেউ কোনো কথা বলল না। লোহার গরাদ দেওয়া দরজার ওপারে তখন আলোর ভাব কমে এসেছে। বাইরে বোধহয় বিকেল হলো।

চার পাঁচ দিন কেটে গেল। মারিয়া ওর গয়নাগাঁটি স্বর্ণমুদ্রা যা ছিল সবই আলবার্তোকে দিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে আলবার্তো মারিয়া যে ভাইকিং রাজার মেয়ে এটা জেনেছে। ও ঠিক করেছে—কোনো বন্দরের ক্রীতদাস কেনা বেচার হাটে ভাইকিংদের বিক্রি করে দেবে। তারপর ভাইকিংদের দেশের বন্দরে যাবে। মারিয়ার মুক্তিপণ হিসেবে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভাইকিং রাজার কাছে দাবি করবে।

জাহাজ চলল। দিনের পর দিন। ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে জীবন কাটতে লাগল কয়েদ ঘরে।

ওদিকে পাঁচ নম্বর কেবিনে মারিয়ারও একঘেয়ে বন্দিনীজীবন কাটছে। মারিয়ার বেশি চিন্তা ফ্রান্সিসদের জন্যে। ও তো তবু আকাশ আলো সমুদ্র দেখতে পায়। ফ্রান্সিসরা তো অন্ধকারে পড়ে আছে। আলবার্তো মারিয়াকে মাত্র একবার ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছে। আধঘণ্টার জন্যে।

মারিয়া আসে। লোহার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। ওর মুখ বিষণ্ণ। ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা হয়। সামান্য কথাবার্তা। দু'জনের কারো কিছুই তো বলবার নেই। যা কিছু কথা এই বন্দীজীবন নিয়েই। মারিয়ার কাছেই ফ্রান্সিস জেনেছিল যে আলবার্তো ওর ক্যারাভেল জাহাজের পেছনে ফ্রান্সিসদের জাহাজটাও বেঁধে নিয়ে চলেছে। মারিয়া কখনও কখনও ফিসফিস করে বলে—'ফ্রান্সিস—এই বন্দীদশা থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই?'

ফ্রান্সিসও চাপাস্বরে বলে—'আছে। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই মুক্তি পেতে হবে আমাদের কারো জীবন বিপন্ন না করে আর সময় সুযোগ বুঝে। ওরা এসব কথা খুব আস্তে বলে, যাতে পাহারাদারদের কানে না যায়। মারিয়া এভাবে প্রতিদিনই আসে। কথা বলে। চলে যায়।

এর মধ্যে ফ্রান্সিসের চারজন ভাইকিং বন্ধু নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল পালাবে। কথাটা ওরা আর কাউকেই বলল না।

সেদিন রাতে তিনজন জলদস্যু পাহারাদার লোহার শিকের দরজা খুলে খাবার নিয়ে ঢুকল। সেই চারজন ভাইকিং পাহারাদারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন পাহারাদারকে কাবু করল। কিন্তু হাত বাঁধা অবস্থায় কি লড়াই করা চলে? বাকি দু'জন পাহারাদার তরোয়াল নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাইকিং চারজন তরোয়ালের মার ঠেকাবে কী করে? চারজনই তরোয়ালের ঘায়ে আহত হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত হলো। রক্তাক্ত দেহে ওরা গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিসরা যে ওদের সেবা-শুশ্রূষা করবে তারও উপায় নেই। সবাইর হাত বাঁধা। পাহারাদাররা দরজা বন্ধ করে পাহারা দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস একজন পাহারাদারকে ডাকল। সে দরজার কাছে মুখ বাড়াল। ফ্রান্সিস বলল—'আমার বন্ধুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।'

—'ক্যাপ্টেন আলবার্তোর হুকুম না হলে হবে না।' পাহারাদার বলল।

ফ্রান্সিস ভীষণ রেগে গেল। বলল—'এক্ষুণি আলবার্তোকে আসতে বলো।'

—'ক্যাপ্টেন এখন বিশ্রাম করছেন।' পাহারাদার বলল।

ফ্রান্সিস লোহার দরজায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল —'আমার আহত বন্ধুরা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর উনি বিশ্রাম করছেন?' ফ্রান্সিসের চীৎকার করে বলা কথাগুলো শুনে সব ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে লোহার দরজার কাছে এল। সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো-।' পাহারাদার এই চীৎকার চ্যাঁচামেচিতে বেশ ঘাবড়ে গেল। ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল—'যাও শীগগির।' পাহারাদারটি কী ভাবল কে জানে! ও চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আলবার্তো লোহার গারদ-আঁটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—'আমাদের চারজন বন্ধু আহত। ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।'

আলবার্তো হেসে বলল—'ওরা আমার রক্ষীদের আক্রমণ করেছিল। ফল যা হবার তাই হয়েছে।'

—'কিন্তু ওরা আহত—ওদের চিকিৎসা—।'

আলবার্তো চেঁচিয়ে বলে উঠল—'ওসব হবে না। মরুক ওরা।' ফ্রান্সিসও গলা চড়াল—'যদি বিনা চিকিৎসায় ওরা কেউ মারা যায় তোমাকে আমি ছাড়বো না আলবার্তো। তোমাকে যেখানে যে অবস্থায় পাবো আমি হত্যা করবো।' আলবার্তো হো হো করে হেসে উঠল। বলল—'ঐ স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তোমার জীবন এই কয়েদ ঘরে শেষ হয়ে যাবে।' ফ্রান্সিস আগুন-ঝরা চোখে আলবার্তোর দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বলল না। আলবার্তো চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ফিরে এসে নিজেদের জায়গায় বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। কয়েকজন ভাইকিং তখন জলের পাত্র করে জল এনে আহত বন্ধুদের ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিচ্ছিল।

নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে আহতদের শরীরের ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

কিছুক্ষণ পরে মারিয়া এল। লোহার গরাদ দেওয়া দরজায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস উঠে একটু দ্রুত পায়েই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল—'এক্ষুণি আমাদের জাহাজে চলে যাও। বৈদ্য যে কটা ওষুধের বোয়াম আনতে বলে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে ওদের ভাইকিং বৈদ্যকে ডাকল। বৈদ্য আড়মোড়া ভেঙে উঠল। ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—'মারিয়া আমাদের জাহাজে যাচ্ছে। কী কী ওষুধের বোয়াম আনবে বলে দাও। বৈদ্যও নিচুস্বরে আস্তে আস্তে বলল—'রাজকুমারী আমার কেবিনঘরের তাকে দেখবেন কালো, হলুদ আর নীল রঙের তিনটে বোয়াম আছে। আপনি হলুদ বোয়ামটা থেকে একমুঠো গুঁড়ো একটা কাগজের ঠোঙায় ঢেলে নিয়ে আসবেন।'

—'আমি বোয়ামটাই নিয়ে আসতে পারি।' মারিয়া বলল।

—'তা পারেন। কিন্তু এই কয়েদঘরের দরজায় লোহার শিক লাগানো। এইটুকু ফাঁক দিয়ে বোয়াম ঢুকবে না। আপনাকে প্রত্যেকদিন ঠোঙায় করে লুকিয়ে ওই গুঁড়ো আনতে হবে।' বৈদ্য বলল।

—'মারিয়া দেরি করো না—শীগগির যাও।' ফ্রান্সিস তাগাদা দিল। মারিয়া পাহারাদারদের দিকে তাকিয়ে বলল—'ওদের পোশাক ভীষণ ময়লা হয়ে গেছে। আমি আমাদের জাহাজ থেকে কিছু পোশাক আনতে যাচ্ছি।' পাহারাদার দুজন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। মুখে কিছু বলল না।

মারিয়া ডেকে উঠে এল দ্রুতপায়ে। একজন জলদস্যুকে দেখল মাস্তুলে ঠেসান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। মারিয়া ডাকল—'শুনছো?' লোকটা চোখ মেলল। মারিয়াকে দেখেই একলাফে উঠে দাঁড়াল। তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। মারিয়া হেসে বলল—'লড়াই করতে আসিনি। তুমি তোমাদের দড়ির মইটা ধরো। আমি আমাদের জাহাজে যাবো।'

—'কেন?' জলদস্যু বলল।

—'আমার স্বামী আর বন্ধুরা তো কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। ওদের পোশাক নোংরা হয়ে গেছে। কিছু পোশাক আনবো।'

—'কিন্তু ক্যাপ্টেনের হুকুম ছাড়া—'

—'আরে আমি তো পালাচ্ছি না। ক্যাপ্টেনকে পরে আমি বলবোখন।' মারিয়া বলল।

জলদস্যুটা আর কিছু বলল না। জাহাজের পেছন দিকে চলল। জাহাজের পেছনের কাঠের রেলিংয়ের গায়ে একটা দড়ির মই আটকানো। মইটার মাঝে মাঝে কাঠের ফালি বাঁধা। মইটা বাঁধা রয়েছে ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে। দুটো জাহাজ একটা মোটা কাছিতে বাঁধা। জলদস্যুটি মইয়ের একটা মাথা কাঁধে নিয়ে কাছিটা ধরে ঝুলে ঝুলে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠল। তারপর কাছিটা একটা হুকএর সঙ্গে আটকে টেনে ধরে রইল। মারিয়া মইয়ের কাঠের ফালিগুলোর ওপর পা রেখে রেখে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মারিয়াকে আসতে হলো। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈদ্যর কেবিনঘরে ঢুকল। তাকের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে খুঁজতে হলুদ বোয়ামটা পেল। বোয়ামটা নিয়ে মারিয়া নিজের কেবিনঘরে চলে এল। নিজের আর ফ্রান্সিসের কিছু পোশাক নিল। অন্য কেবিনঘরগুলোতে ঢুকে অন্য ভাইকিং বন্ধুদের পোশাকও কিছু নিল। সব পোশাক পেঁচিয়ে বাঁধবার আগে হলুদ বোয়ামটা ভেতরে রেখে দিল। পেঁচিয়ে বাঁধা পোশাকের বোঁচকার মধ্যে রইল বোয়ামটা।

পোশাকের বোঁচকা দেখে জলদস্যুটি কিছু বলল না। মারিয়া মই বেয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ক্যারাভেল জাহাজে ফিরে এল। নিজের কেবিনে ঢুকল। কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে থেকে হলুদ বোয়ামটা বের করল। একটা রুমালে হলুদ গুঁড়ো একমুঠো ঢালল। বোয়ামটা কাঠের তাকে লুকিয়ে রাখল। তারপর কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে ওষুধ বাঁধা রুমালটা রেখে কয়েদঘরের সামনে এল। চারজন ভাইকিং পালাবার চেষ্টা করেছিল বলে এখন নিয়মে কড়াকড়ি করা হয়েছে। সব ভাইকিংদের হাত খুলে দেওয়া হয়েছে। খাবারদাবার দরজার নিচের একটা ফোকর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলবার্তোর হুকুম কোনো কারণেই যেন দরজা খোলা না হয়। মারিয়া কাপড়ের পুঁটলি খুলে একটা করে পোশাক গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস টেনে নিতে লাগল। হলুদ ওষুধজড়ানো পোশাকটা দেবার সময় মারিয়া বেশ জোরে বলল—'এই পোশাকটা এক্ষুণি পর।' ফ্রান্সিস বুঝল। মৃদু হেসে বলল—'আচ্ছা।' তারপর পোশাকটা নিয়ে বৈদ্যর কাছে এল। পোশাকের ভাঁজ থেকে রুমালে বাঁধা ওষুধটা দিয়ে বলল—'এই যে ওষুধ।' বৈদ্য রুমালের গিঁট খুলে ওষুধটা মেঝেয় ঢালল। বলল—'জল।' একজন ভাইকিং নারকেলের মালায় করে, জল নিয়ে এল। বৈদ্যর নির্দেশমতো হলুদের গুঁড়োর মধ্যে অল্প করে জল ঢালতে লাগল। বৈদ্য গুঁড়োটা মাখতে লাগল। একটু পরেই আঠা আঠার মতো দেখতে হলো। বৈদ্য ওষুধ নিয়ে আহত ভাইকিং ক'জনের ক্ষতে লাগিয়ে দিল। একটু জ্বালা করে উঠেই একটা ঠাণ্ডাভাব লাগল। ওদের ব্যথা অনেক কমে গেল।

পরের ক'দিনই মারিয়া একটা করে পোশাক আনল আর হলুদ গুঁড়ো ওষুধ দিয়ে গেল। তিনজন আহত ভাইকিং মোটামুটি সুস্থ হলো। কিন্তু একজন আহত ভাইকিং ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওষুধ লাগানো চলল। কিন্তু ওর বুকের ক্ষতস্থান ফুলে পেকে উঠল। একদিন দুপুরে বাড়াবাড়ি অবস্থা হলো। প্রচণ্ড জ্বরে ওর গা পুড়ে যেতে লাগল। ভাইকিংটি প্রলাপ বকতে লাগল। সন্ধ্যের সময় অজ্ঞান হয়ে গেল। একটু রাত বাড়তে ভাইকিংটি হঠাৎ চোখ বড় বড় করে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করল। শেষবারের মতো ওর শরীরটা নড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস মৃত বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল। ওর চোখ ফেটে জল এল। দু'হাতে মুখ চেপে ও কেঁদে উঠল। হ্যারি এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখল। সব ভাইকিং বন্ধুরা মুখ নিচু করে বসে রইল। অনেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস চোখ মুছে হ্যারিকে বলল—'হ্যারি—ও নিজের জীবন দিয়ে আমাদের মুক্তির উপায় করে দিয়ে গেল।' হ্যারি ঠিক বুঝল না। তবে এটা বুঝল ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই কিছু ভেবে স্থির করেছে। হ্যারি কোনো কথা বলল না।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গেল। রক্ষীদের বলল—'আমাদের এক বন্ধু মারা গেছে। আলবার্তোকে খবর দাও।' একজন রক্ষী চলে গেল। একটু পরেই কাঠের মেঝেয় জুতোর শব্দ তুলে আলবার্তো এল। পেছনে জলদস্যুদের বৈদ্য। রোগা। পাকা দাড়ি। কয়েদ ঘরের দরজা খোলা হলো। শুধু বৈদ্য ঢুকল। মৃত ভাইকিংটির বুকে কান পাতল। আঙুল দিয়ে চোখ খুলে দেখল। হাতের পায়ের নাড়ি টিপে দেখল। তারপর মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলল—'মারা গেছে।' কয়েদঘরের বাইরে গিয়ে আলবার্তোকে বলল সে কথা। আলবার্তো ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—'এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলে এই অবস্থাই হবে। মড়া কালকে সমুদ্রে ফেলা হবে।

ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। চীৎকার করে বলল, —'না আজকে রাতেই মড়া এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে।'

—'কেন?' আলবার্তো বেশ আশ্চর্য হয়েই বলল।

—'আমরা একটা মড়ার সঙ্গে রাত কাটাতে পারবো না।'

আলবার্তো ঠাট্টা করে হেসে বলল—'কিছুক্ষণ আগেও তো ও তোমাদের বন্ধু ছিল।'

—'সে ছিল ছিল। এখন তো একটা মড়া। বিদেয় করো এটাকে।' ফ্রান্সিস বলল।

—'হুঁ-তাই হবে।' আলবার্তো পাহারাওয়ালাদের সে কথা বলল। তারপর চলে গেল।

ফ্রান্সিসের এ ধরনের কথাবার্তায় ভাইকিং বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল। ফ্রান্সিসের এ কী কথাবার্তা! এ কী ব্যবহার! বন্ধুদের জন্যে যে ফ্রান্সিস নিজের জীবন দিতে তৈরি থাকে সে এক মৃত বন্ধু সম্পর্কে এরকম কথা বলছে! হ্যারির সহ্য হলো না, ও ফ্রান্সিসের মুখোমুখি দাঁড়াল। দৃঢ়স্বরে বলল—'ফ্রান্সিস সাবধান, মৃত বন্ধু সম্পর্কে এরকম কথা যদি আর একটা বল, তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব না।'

ফ্রান্সিস শুধু ফিসফিস করে বলল— 'রাত্রি চাই— অন্ধকার চাই।' তারপর ফ্রান্সিস দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে একজন পাহারাদারকে ডাকল। বলল—'আচ্ছা ভাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

—'কী কথা?' একজন পাহারাদার এগিয়ে এসে বলল।

—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাহাজটা থেমে আছে অথবা খুব আস্তে চলছে।'

—'আরে—ঠিক বলেছো। দু'দিন যাবৎ হাওয়া পড়ে গেছে—জাহাজ প্রায় চলছেই না। কিন্তু তুমি কী করে বললে?'

—'আমরা ভাইকিং—সমুদ্র জাহাজ এসবের মতিগতি আমরা সহজেই ধরতে পারি।' ফ্রান্সিস তারপর বলল—'তা ভাই দেরি করছো কেন? মড়াটা তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও।'

—'তোমাদের রাতের খাওয়া হলেই নিয়ে যাবো।' পাহারাদার জলদস্যুটি বলল।

—'জলদি কর, জলদি কর।' ফ্রান্সিস কথাটা বলে দরজার কাছ থেকে চলে এল।

ফ্রান্সিস দু-একজন ভাইকিং বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু এক হ্যারি ছাড়া আর সবাই মুখ ফিরিয়ে রইল। মৃত বন্ধু সম্পর্কে ফ্রান্সিস যা কিছুক্ষণ আগে বলেছে সেটা বন্ধুরা ভুলতে পারেনি। ছিঃ, এত নোংরা মন ফ্রান্সিসের! একটু পরেই পাহারাদাররা রাতের খাবার দিয়ে গেল। প্রায় কেউই বিশেষ খেল না। ফ্রান্সিস কিন্তু পেটপুরে খেল। সব বন্ধুরা দেখল সেটা। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল তারপর। একটু পরে একজন পাহারাদার জলদস্যু একটা মোটা কাপড়ের বস্তা গরাদের মধ্যে দিয়ে ভাঁজ করে গলিয়ে দিল। সঙ্গে একটা দড়ি। পাহারাদার বলল—'মড়াটা বস্তায় পুরে মুখ বেঁধে দরজার কাছে রেখে সবাই সরে যাও। আমরা ঢুকে মড়া নিয়ে আসবো। তখন কেউ কাছে আসবে না।

শাঙ্কো বস্তা দড়ি নিয়ে এল। এবার মৃতদেহ এই বস্তায় ভরতে হবে। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে ডাকলো—'শাঙ্কো।' শাঙ্কো ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে বলল—'শীগগির ছোরাটা দাও।' শাঙ্কো ঢোলা জামার নিচ থেকে ছুরি বার করে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঢোলা জামায় ছোরাটা ভরে রাখল। সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—'তোমরা সব দরজার কাছে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়াও যাতে পাহারাদাররা দেখতে না পায় এখানে কী হচ্ছে। সবাই এবার বুঝল ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই কোনো ফন্দী এঁটেছে। সবাই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভিড় হয়ে গেল দরজার সামনে। ফ্রান্সিস দ্রুত বস্তাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।



বলল—'শাঙ্কো, বস্তার মুখ বেঁধে দাও।' শাঙ্কো তাড়াতাড়ি বস্তার মুখ বাঁধল। ফ্রান্সিস বস্তাবন্দী হলো। হ্যারি বলে উঠল—'সাবাস্ ফ্রান্সিস।' ফ্রান্সিস বস্তার মধ্যে থেকে বলল—'আস্তে।'

বিস্কো শাঙ্কো আর কয়েকজন ভাইকিং বস্তাটা কাঁধে নিয়ে দরজার কাছে এল। একজন পাহারাদার বলল—'মড়া আবার কাঁধে করে নিয়ে আসছো। টেনে হিঁচড়ে আনো।'

—'না আমাদের বন্ধু তো—' হ্যারি বলল—'তা ভাই তোমরাও কাঁধে করে নিয়ে যেও।

—'কাঁধে করে পারবো না। তবে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবো।' একজন পাহারাদার বলল।

দরজা খুলে ওরা বস্তাটা ধরল। ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। ততক্ষণে একজন পাহারাদার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

বস্তাবন্দী ফ্রান্সিসকে চার পাঁচজন জলদস্যু ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল। ডেকে এসে আর ঝুলিয়ে নিল না। ডেকের কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে হিড়হিড় করে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। ঘষটা লেগে ফ্রান্সিসের মাথার পেছনে পিঠে জ্বালা করতে লাগল। ফ্রান্সিস দাঁত চেপে সহ্য করতে লাগল। মুখে কোনো শব্দ করল না। ডেকের রেলিঙের কাছে এসে দু'জন জলদস্যু বস্তাবন্দী ফ্রান্সিসকে দোলাতে লাগল। তারপর ছুঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

জলে পড়েই বস্তাসুদ্ধ ফ্রান্সিস জলে ডুবে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জামার তলা থেকে ছোরাটা বের করে মোটা কাপড়ের বস্তায় ঢুকিয়ে দিয়েই জোরে হ্যাঁচকা টান দিল। বস্তা লম্বালম্বি কেটে গেল। ফ্রান্সিস বস্তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। জলের মধ্যে এইজন্যে ওকে বেশ কিছুক্ষণ দম আটকে থাকতে হলো। মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো আনার জন্যে ফ্রান্সিস মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে থেকে দম বেশিক্ষণ রাখার অভ্যেস করেছিল। এখন সেটা কাজে লেগে গেল। হাতে পায়ে জলের মধ্যে কয়েকটা ধাক্কা দিয়েই ও জলের ওপরে ভেসে উঠল। হাঁপাতে লাগল। ওর ভাগ্যও ভালো। দেখল ক্যারাভেল জাহাজ আর ওদের জাহাজ খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে। মৃদু জ্যোৎস্না পড়েছে সমুদ্রের জলে, জাহাজে। বাতাস তেমন জোরে বইছে না। তাই ঢেউও কম।

ফ্রান্সিস ওদের জাহাজটা লক্ষ্য করে সাঁতরাতে লাগল। একটু পরেই ওদের জাহাজের পেছন দিকের জলেডোবা হালটা ধরল। হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পা রেখে



মুখে কোনো শব্দও করতে পারল না।

একটু উঠল। ও তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। একটু জিরোল। হাঁপানো একটু কমল। দেখল হাতের কাছে একটা মোটা কাছি ঝুলছে। ফ্রান্সিস কাছিটা বেয়ে বেয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। একসময় হালের গায়ে পা রেখে জাহাজের ডেকে নামল। দেখল ওদের জাহাজের কোথাও আলো জ্বলছে না। ওর গায়ের পোশাক ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। সিঁড়ি দিয়ে নামল অন্ধকারে। দ্রুত পায়ে নিজের কেবিন ঘরে ঢুকল। দ্রুত হাতে ভেজা পোশাক ছেড়ে শুকনো পোশাক পরে নিল। দেয়াল থেকে তরোয়ালটা নিয়ে কোমরে গুঁজল। তারপর একটা কাঁচঢাকা লণ্ঠন জ্বালল। সেটা নিয়ে চলল অস্ত্রঘরের দিকে। অস্ত্রঘর খুলল। বিস্কোর জন্যে আর একটা তরোয়াল কোমরে গুঁজে নিল। এবার শাঙ্কোর ধনুকটা নিল কাঁধে, বুকে ছিলাটা চেপে রাখল। কাঁধে ঝোলাল তীরভর্তি তূণীরটা। আলোটা নিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ির কাছে এল। আলোটা নিভিয়ে ফেলল। আলো জলদস্যুদের নজরে পড়লে বিপদে পড়তে হবে। কাঁচঢাকা লণ্ঠনটা রেখে দিল। ডেকে উঠে এল। দেখল জলদস্যুদের ক্যারাভেলের ডেকে কয়েকটা আলো জ্বলছে। গভীর রাত। জলদস্যুরা নিজেদের কেবিনে ঘুমিয়ে আছে। মাস্তুলের আড়ালে দাঁড়াল ফ্রান্সিস। কিছুক্ষণ লক্ষ্য রেখে দেখল চারপাঁচজন জলদস্যু ডেকে জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। দু'জনের হাতে খোলা তরোয়াল। বাকিরা তরোয়াল পাশে রেখে ডেকে বসে আছে।

ফ্রান্সিস ওদের জাহাজের সামনের দিকে এল। চাঁদের আলো খুবই অস্পষ্ট। তবু যদি জলদস্যুরা দেখে ফেলে তাই ও হামাগুড়ি দিয়ে এল। কাঠের ফালি বাঁধা দড়ির মইটা তখনও দু'টো জাহাজের মধ্যে লাগানো ছিল। মারিয়া ঐ দড়ির মই দিয়েই দু জাহাজে পারাপার করেছিল। ফ্রান্সিস হামাগুড়ি দিয়ে দড়ির মইয়ের ওপর দিয়ে এল। নামল জলদস্যুদের ক্যারাভেল-এর ডেকে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। না, জলদস্যু পাহারাদাররা ওর আসা বুঝতে পারেনি।

ফ্রান্সিস এবার দড়ির মইয়ের হুকটা খুলে দিয়েই জাহাজের অন্ধকার কোণাটায় সরে এল। কাঠবাঁধা মইটা জাহাজের গায়ে গিয়ে লাগল। বেশ জোরে শব্দ উঠল—খট্‌ট্—। খোলা তরোয়াল হাতে একজন জলদস্যু ছুটে এল। জাহাজের হালের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখতে লাগল শব্দটা কিসের। ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। এক লাফে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে জলদস্যুটার ঘাড়ে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে এক ঘা মারল। জলদস্যুটি মুখে কোনো শব্দও করতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে রেলিঙের মুখ জুড়ে পড়ে রইল। অন্য পাহারাদার জলদস্যুটি দু একবার ওর অজ্ঞান বন্ধুকে ডাকাডাকি করল। তারপর খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বুঝল এর সঙ্গে তরোয়াল নিয়ে লড়তে গেলে তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ হবে। ডেকে বসে থাকা জলদস্যুরা শব্দ শুনে ছুটে আসবে। কাজেই কোনোরকম শব্দ করা চলবে না। নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। ও অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। জামার তলা থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর পেছন থেকে জলদস্যুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে তার মুখ চেপে ধরল যাতে কোনো শব্দ না করতে পারে। তারপর ছোরাটা আমূল ওর পিঠে বসিয়ে দিল। জলদস্যুটা কয়েকবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ওকে ধরে আস্তে আস্তে ডেক-এর ওপর শুইয়ে দিল, যাতে কোনো শব্দ না হয়।

এবার ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল অন্য পাহারাদাররা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। এত কাণ্ড হলো ওরা কিছুই বুঝতে পারল না।

সিঁড়ির ঘর হাত বারোর মধ্যে। ফ্রান্সিস ডেকের মেঝেয় বুক পেতে শুয়ে পড়ল। তারপর বুক দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল। তারপর নিচে নামায় সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল। তখনই ফ্রান্সিস শুনল ডেকের জলদস্যুরা ওদের বন্ধু দুজনকে ডাকাডাকি করছে। ফ্রান্সিস বুঝল—আর দেরি করা চলবে না। কাঁচঢাকা আলোয় ও দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

কয়েদঘরের সামনে যখন এল তখন ও হাঁপাচ্ছে। দেখল দু'জন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে কয়েদঘর পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস ভাবল এদের হত্যা না করে যাতে কয়েদঘরের চাবিটা নেওয়া যায় ও সেই চেষ্টাই করবে। কয়েদঘরের দরজার কাছে একটা কাঁচঢাকা বাতি ঝুলছিল। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। তরোয়াল উঁচিয়ে ও আস্তে আস্তে পাহারাদার দু'জনের সামনে এসে দাঁড়াল। পাহারাদার দুজন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এ কী? এ কী করে গারদঘরের বাইরে এল। তাও হাতে তরোয়াল নিয়ে। পরক্ষণেই ওরা লড়াইয়ের জন্যে তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল—'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসো না। আমি ফ্রান্সিস তোমাদের মতো দশজনের সঙ্গে লড়াই করা আমার কাছে কিছুই না। গারদঘরটা খুলে দাও। বন্ধুদের মুক্তি দাও। আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করবো না।'

পাহারাদার দু'জন একটু থমকে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একজন তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একপাক ঘুরে তরোয়াল চালাল বিদ্যুৎবেগে। ওর মাথায় তরোয়ালের কোপ বসে গেল। জলদস্যুটা তরোয়াল ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অন্য পাহারাদারটির মুখ মৃত্যুভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল! ফ্রান্সিস গম্ভীরগলায় বলল—'দরজা খুলে দাও।' লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোমরে গোঁজা চাবির তাড়া বের করল। কয়েদঘরের তালা খুলতে লাগল।

ওদিকে হ্যারি সারারাত ঘুমুতে পারেনি। ওর এক চিন্তা—ফ্রান্সিস বস্তা কেটে বেরুতে পারল কিনা, হয়তো পারেনি। এসব বিপদের কথা ভাবছিল। তখনই ও কয়েদঘরের দরজার কাছে ফ্রান্সিসের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। ও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বিস্কো শাঙ্কো অন্য বন্ধুদের ধাক্কা দিতে দিতে চাপাস্বরে বলতে লাগল—'ওঠ—ওঠ—ফ্রান্সিস এসেছে।' দু'জন একজন করে সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দাঁড়াতে লাগল সবাই। হ্যারি চাপাস্বরে বলল—'কোনোরকম শব্দ করো না।' তখনই কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস এক লাফে ঢুকল। কয়েদঘরে ঢুকেই ফ্রান্সিস ঠোঁটে আঙুল রাখল। সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে সবাই চুপ করে রইল। হ্যারি ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ওর চোখে জল এসে গেল।

ফ্রান্সিস বলল—'পাগলামি করো না। এখন বড় লড়াই সামনে।' ফ্রান্সিস বিস্কোকে তরোয়াল খুলে দিল। শাঙ্কোকে দিল তীর ধনুক। বলল—'ভাইসব, এবার চূড়ান্ত লড়াই। সবাই জলদস্যুদের অস্ত্রাগারে চলে যাও। অস্ত্র নিয়ে প্রত্যেক কেবিনঘরে ঢুকে জলদস্যুদের বন্দী কর। প্রয়োজনে লড়াই কর। তারপর সবাইকে বন্দী করে ডেকে নিয়ে এসো। জলদি। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করো না।'

ওদিকে ডেকের ওপরে যে পাহারাদার তিনজন ছিল তারা মৃত ও আহত বন্ধু দু'জনকে দেখে বুঝল কিছু একটা হয়েছে। ওরা সিঁড়ির দিকে ছুটল কেবিনঘরে ঘুমন্ত বন্ধুদের ডাকতে। কিন্তু সিঁড়ির কাছে আসতেই দেখল খোলা তরোয়াল হাতে ভাইকিংরা দলে দলে উঠে আসছে। ওরা বুঝল এখন লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। তবু দু'জন তরোয়াল হাতে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আহত হয়ে গড়িয়ে পড়ল। গোঙাতে লাগল। কেবিন থেকে নিরস্ত্র জলদস্যুদের বন্দী করে এনে ডেকে জড়ো করা হলো।

এদিকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো খুঁজে মারিয়াকে যে কেবিনঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে সে ঘরটা পেল। দেখল বাইরে তরোয়াল হাতে একজন পাহারাদার দাঁড়িয়ে। পাহারাদারটি কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ হাতে গলা চেপে ধরল। লোকটা বেরিয়ে আসা চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো পাহারাদারটির হাত থেকে তরোয়ালটা কেড়ে নিল। ফ্রান্সিস বলল—'যাও ডেকে যাও।' তারপর ওর গলা ছেড়ে দিল। ফ্রান্সিস তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। ও এগিয়ে এসে দরজায় টোকা দিল। একবার, দু'বার। মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। বলল—'কে?' ফ্রান্সিস বলল—'আমি ফ্রান্সিস। শীগ্‌গির দরজা খোল।' দরজা খুলে গেল। মারিয়া হাসতে হাসতে ছুটে এসে ফ্রান্সিসের বাঁহাতটা জড়িয়ে ধরল। বলল—'তুমি—মানে—আমি কী বলবো—।' ফ্রান্সিস হেসে বলল—'কিচ্ছু বলতে হবে না। শীগ্‌গির ডেকে চলে যাও।—ওখানে সবাই আছে।'

—'কিন্তু তোমরা?'

—'আলবার্তোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি। তুমি যাও।' মারিয়া আর কথা বাড়াল না। সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো আলবার্তোর ঘরের সামনে এল। দেখল—দরজা খোলা। একজন জলদস্যু ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় আলবার্তোকে লড়াইয়ের খবর দিতে এসেছে।



ছোরাটা আমূল ওর পিঠে বসিয়ে দিল।



হিম্মৎ থাকে তো লড়ো।

জলদস্যু ওদের দেখেই চীৎকার করে উঠল—'ক্যাপ্টেন—ঐ যে।' আলবার্তো দ্রুত এগিয়ে এল। দেখল তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে। পেছনে তীরধনুক হাতে শাঙ্কো। আলবার্তো নিজেও তখন যুদ্ধসাজে তৈরি। সোনা দিয়ে বাঁধানো ওর তরোয়ালের হাতল। ও হাতল চেপে এক টানে তরবারি কোষমুক্ত করল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—'তাহলে আলবার্তো। তুমি লড়াই চাও?' আলবার্তো কোনো কথা বলে না তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। ফ্রান্সিস বলল—'তোমার জাহাজ এখন আমাদের কব্জায়। সব জলদস্যু বন্দী। এরপরেও তুমি লড়াই করতে চাও।' আলবার্তো ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল—'হ্যাঁ, হিম্মৎ থাকে তো লড়ো।'

—'বেশ। এখানে এই ছোট ঘরে লড়াই করা অসুবিধে। ডেকে চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

আলবার্তোকে আর জলদস্যুটিকে সামনে রেখে ফ্রান্সিসরা সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল। দেখল—ভোর হয়েছে। নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে, সমুদ্রের জলে, জাহাজে। একটু পরেই আলবার্তোর সঙ্গে তরোয়ালের লড়াইয়ে নামতে হবে। এই সুন্দর রোদে উজ্জ্বল নীল আকাশ—কতদূর ছড়িয়ে আছে। শান্ত সমুদ্রের জলে রোদের নাচন—ফ্রান্সিসের মনটা কেমন যেন করে উঠল। এই অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে লড়াই—রক্তপাত—হত্যা? ওর মন মানল না। শেষবার চেষ্টা করতে হবে যাতে এই অমানবিক রক্তপাত হত্যা এড়ানো যায়।

কিন্তু আলবার্তো নির্বিকার। ডেকে দাঁড়িয়ে ও তরোয়াল ওঠাল। ওর মুখ কঠিন। চোখে হত্যার নেশা। মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলল—'ফ্রান্সিস কী হলো? তৈরি হও।' ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না। তরোয়াল নামিয়ে রাখল।

—'কী হলো বীর ভাইকিং? ভয় পেয়ে গেলে?' আলবার্তো বলল। ফ্রান্সিসের চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু মনকে শান্ত করল। বলল—'আলবার্তো, আমি জানি তুমি নরঘাতক। অনেক নিরীহ মানুষকে তুমি হত্যা করেছো। ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করার জন্যে নিরীহ মানুষদের কয়েদঘরে জানোয়ারের মতো দীর্ঘদিন বন্দী করে রেখেছো। সেই তোমাকে আমার অনুরোধ—যে জীবন তুমি কাটিয়েছো, সেই জীবনের কথা ভুলে যাও। নতুন করে সৎ মানুষের মতো বাকি জীবনটা কাটাও। মানুষকে হত্যা নয়—মানুষকে ভালোবাসতে শেখ। মানুষের সেবা কর, দুঃখী-অভাবী মানুষদের দুঃখ দূর কর, অভাব দূর কর। তোমার ধনসম্পত্তি তো কম নয়।'

আলবার্তো হো হো করে হেসে উঠল। বলল—'ফ্রান্সিস—তুমি সত্যি ভয় পেয়ে গেছো।'

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। বলল—'আলবার্তো তোমাকে আমি বাঁচার সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি বুঝলে না। তোমার মতো নরপশুরা জীবনের উজ্জ্বল দিক কোনোদিন দেখতে পায়না। যাকগে—তুমিই আমাকে লড়াইয়ে নামালে। আমার কোনো দায়িত্ব রইল না।'

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই আলবার্তো তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে আলবার্তোর তরোয়ালের মার ঠেকাল। শুরু হলো দু'জনের তরোয়ালের লড়াই। ডেকের একপাশে বসে আছে নিরস্ত্র জলদস্যুর দল। অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র ভাইকিংরা আর মারিয়া। মারিয়া শুনেছে তরোয়াল চালনায় ফ্রান্সিস সবার সেরা। কিন্তু কোনোদিন ফ্রান্সিসের তরোয়াল লড়াই দেখেনি। আজকে সেই সুযোগ এল। মারিয়া এমনিতে খুব শক্ত মনের মেয়ে। কিন্তু আজকে ও একটু আশঙ্কাই বোধ করল। কারণ ও ঠিক বুঝল যে আলবার্তো সুযোগ পেলে ফ্রান্সিসকে হত্যা করতে পিছ্পা হবে না। আলবার্তো বার বার আক্রমণ করতে লাগল। ফ্রান্সিস এদিক ওদিক সরে যেতে লাগল। তরোয়ালের মার

ঠেকাতে লাগল। ও চাইছিল যাতে আলবার্তো অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। আলবার্তো সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। আলবার্তোর একটা তরোয়ালের মার ঠেকাতে গিয়ে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াতে গেল। তখনই আলবার্তো তরোয়াল ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিক থেকে তরোয়াল চালাল। তরোয়ালের চকচকে ফলাটা ফ্রান্সিসের বাঁ বাহু ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। পোশাকটা কেটে তরোয়াল বসে গেল। অনেকটা কেটে গেল। রক্তের ধারা বইল। মারিয়া চীৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস একবার ক্ষতস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলবার্তোর ওপর। এবার আর আত্মরক্ষা নয়। ফ্রান্সিস আক্রমণ করল। ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মার ঠেকাতে ঠেকাতে আলবার্তো ভালো করেই বুঝতে পারল এ বড় কঠিন ঠাঁই। মারিয়া ফ্রান্সিসের নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে অবাক হয়ে গেল। কী অনায়াস ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাচ্ছে। বিদ্যুৎগতিতে স্থান পরিবর্তন করছে। কিন্তু পিছোচ্ছে না। একইভাবে আক্রমণের চাপ রাখছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ পরিশ্রান্ত আলবার্তোর হাত অবশ হয়ে এল। তরোয়াল আর হাতের বশে রইল না। ও এলোমেলো তরোয়াল চালাতে লাগল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। এক পাক দ্রুত ঘুরেই শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে তরোয়ালের এক ঘা মারল আলবার্তোর তরোয়ালে। আলবার্তোর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গিয়ে মাস্তুলের কাঠে বিঁধে গেল। বেঁধা অবস্থায় তরোয়ালটা দুলতে লাগল। নিরস্ত্র আলবার্তো দু'হাত ওপরে তুলে হাঁপাতে লাগল। ওর চোখে মুখে মৃত্যুভয় ফুটে উঠল। ফ্রান্সিস শেষ আঘাতের জন্য তরোয়াল তুলল। ফ্রান্সিসও হাঁপাচ্ছে তখন। কিন্তু তরোয়াল চালাল না। আস্তে আস্তে তরোয়াল নামাল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'তোমার জাহাজ আর তোমার দলবল নিয়ে যাও—এক্ষুণি—এই তল্লাট ছেড়ে পালাও।' ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। কেউ লক্ষ্য করেনি যে আলবার্তোর কোমরের বেল্ট-এ একটা ছোরা গোঁজা আছে। এইবার আলবার্তো দ্রুতহাতে ছোরাটা টেনে বের করল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। শাঙ্কো আলবার্তোকে কোমরে হাত দিতে দেখেই বুঝেছিল ওর উদ্দেশ্য কি। আলবার্তো ছোরা ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কো ফ্রান্সিসের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জনে জড়াজড়ি করে ডেকের ওপর পড়ে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছোরাটা পাক খেতে খেতে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তখনই মাস্তুলের ওপর বসে থাকা নজরদার চেঁচিয়ে বলল—'ডাঙা দেখা যাচ্ছে—ডাঙা।'

সকলেই হৈ হৈ করে উঠে জাহাজের রেলিঙের কাছে এসে জড়ো হলো। সত্যি দূরে বিস্তীর্ণ বালির তটরেখা দেখা যাচ্ছে। এই হৈচৈ-র মধ্যে আলবার্তো জাহাজের রেলিঙে দ্রুত উঠে পড়ল। উদ্দেশ্য সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়া। কারণ কাছেই সমুদ্রতীর। সাঁতরে পালাতে পারবে। কিন্তু আলবার্তো শাঙ্কোর নজর এড়াতে পারেনি। শাঙ্কো অতি দ্রুত ধনুকে তীর পরিয়েই তীর ছুঁড়ল। একেবারে নিখুঁত নিশানা শাঙ্কোর। তীর আলবার্তোর পিঠে বিঁধে গেল। আলবার্তো দু'হাত ওপরে তুলে ছিটকে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। ডেক থেকে ভাইকিংরা ও জলদস্যুর দল দেখল যে আলবার্তো আর ভেসে উঠল না। জলে যেখানে আলবার্তো পড়েছিল সেখানে জলটায় একটু লাল রঙ লাগল।

হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—'ফ্রান্সিস, আমাদের এক বন্ধুর মৃতদেহ এখনও কয়েদঘরে পড়ে আছে।' ফ্রান্সিস দ্রুত বলে উঠল—'সত্যিই তো। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়নি।' কথাটা বিস্কোর কানে গেল। বলল—'আমরা কয়েকজন যাচ্ছি।'

একটু পরেই বিস্কোরা কয়েদঘর থেকে বন্ধুর মৃতদেহ ডেকে এনে শুইয়ে দিল। সবাই চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল। ভাইকিংদের মধ্যে যে ধর্মযাজকের কাজ করে সে এগিয়ে এল। তার গলায় ঝুলছে একটা ভাঁজ করা চাদরের মতো। হাতে একটা চামড়ার ছেঁড়াখোঁড়া বাইবেল। ওটার পাতাগুলো সব খোলা। ভাইকিং যাজক তাই থেকে একটা পাতা খুলে বিড়বিড় করে কি পড়ল। সবশেষে বলল—'আমেন।' তখন মৃতদেহটি একটা মোটা কাপড়ের থলেতে ঢোকানো হলো। মাথার দিকে বেঁধে দেওয়া হলো। দু'জন ভাইকিং মৃতদেহটি নিয়ে জাহাজের রেলিঙ-এর ধারে গেল। মৃতদেহটি দোলাতে দোলাতে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিরস্ত্র জলদস্যুর দল থেকে একজন যুবক জলদস্যু ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—'আমাদের ক্যাপ্টেন মারা গেছে। এখন আমরা কি করবো?'

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডেকে বলল—'এখন এই জলদস্যুদের নিয়ে কি করবে?'

—'ওদের মুক্তি দেব—ওদের ক্যারাভেল জাহাজ নিয়ে ওরা চলে যাবে। কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা ওদের করতে হবে বাকি জীবনে আর ওরা জলদস্যুতা করবে না। দেশে ফিরে সৎ জীবনযাপন করবে।'

ফ্রান্সিস যুবকটির দিকে তাকাল। বলল—'কী? এই শর্তে তোমরা রাজী?'

—'হ্যাঁ আমরা রাজী।' যুবকটি বলল।

—'কিন্তু একটা সমস্যার সমাধান এখনই করতে হবে।' হ্যারি বলল।

—'কী সমস্যা?' ফ্রান্সিস বলল।

—'দেখ—আলবার্তোর কেবিন ঘরে নিশ্চয়ই লুণ্ঠিত ধনসম্পদ রয়েছে। এখন আলবার্তো মারা গেছে। ঐ লুঠ করা ধনসম্পত্তির মালিকানা নিয়ে এবার এই জলদস্যুদের নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে।'

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। বলল—'কথাটা সত্যি। এই ধনসম্পত্তির কী হবে?'

শাঙ্কো বলল—'আমরা দখল করবো।'

—'না শাঙ্কো,' ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—'অনেক নিরীহ মানুষের রক্তে ভেজা, চোখের জলে ভেজা ঐ অভিশপ্ত ধনসম্পদ আমরা কোনোমতেই নেব না। হ্যারিকে দায়িত্ব দিচ্ছি—হ্যারিই ঐ ধনসম্পদ জলদস্যুদের মধ্যে যতটা সম্ভব সমান ভাগে ভাগ করে দেবে।'

—'বেশ।' হ্যারি রাজী হলো। জলদস্যু যুবকটিকে হ্যারি বলল—'চলো—তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।' যেখানে জলদস্যুরা বসে আছে যুবকটিকে নিয়ে হ্যারি সেদিকে গেল।

মারিয়া এগিয়ে এল ফ্রান্সিসের কাছে। বলল—'তুমি আহত। কাটা জায়গা থেকে এখনও রক্ত পড়ছে। তুমি কেবিনে চলো। তোমার বিশ্রামও দরকার।'

—'হ্যাঁ চলো।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিস্কোকে বলল—'বিস্কো, আমাদের জাহাজ চালককে বলো আমাদের জাহাজটা তীরের যতটা কাছে সম্ভব যেন নিয়ে যায়।'

দুপুরের খাওয়ার সময় হ্যারি ফিরে এল। ফ্রান্সিসকে বলল—'ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে এসেছি। এবার কী করবে?'

—'ওদের ক্যারাভেল জাহাজের সঙ্গে আমাদের জাহাজ যে দড়িটা দিয়ে বাঁধা সেটা শাঙ্কোকে কেটে দিতে বল। জলদস্যুরা ওদের জাহাজে চড়ে দেশে ফিরে যাক।'

তাই করা হলো। জলদস্যুদের মুক্তি দেওয়া হলো। ওরা ওদের ক্যারাভেল জাহাজে তাড়াতাড়ি পাল খাটাল। হাওয়ার তোড়ে পাল

ফুলে উঠল। ওদের জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে চলল। ডেকে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসরা তা দেখল।

কিছুক্ষণ পরে রসুইঘর আর ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্ব যে তিনজন ভাইকিং-এর হাতে ছিল তারা ফ্রান্সিস আর হ্যারির কাছে এল। একজন বলল—'এবার কি দেশে ফিরবে?'

—'হ্যাঁ।' ফ্রান্সিস বলল। অন্য ভাইকিংটি বলল—'কিন্তু আমরা জানি না আমরা কোথায় এসেছি। তীরের যে বালিয়াড়ি দেখছি তাতে বুঝতে পারছি না এটা কোনো দেশ না, দ্বীপ। দিক ঠিক করে দেশে ফিরতে আমাদের কতদিন লাগবে জানি না।'

—'তা তো ঠিকই।' হ্যারি বলল।

অন্য ভাইকিংটি বলল—'ভাঁড়ারঘরে যা ময়দা চিনি খাবার-দাবার আছে তাতে তবু কিছুদিন চলবে। কিন্তু খাবার জলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। কিছু খাবার জল না যোগাড় করতে পারলে সাংঘাতিক সমস্যায় পড়ে যাবো।'

ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই ভাবল কিছুক্ষণ। হ্যারিই প্রথমে বলল—'ফ্রান্সিস, যে ডাঙাটা দেখা যাচ্ছে ওখান থেকেই খুঁজে পেতে খাবার জল যোগাড় করতে হবে। তারপর দিক ঠিক করে দেশের দিকে পাড়ি দেব।'

—'ঠিক বলেছো তোমরা—ফ্রান্সিস বলল—'তাহলে কালকেই আমরা তীরে নামবো। দ্বীপ হোক আর দেশই হোক খাবার জল খুঁজে বার করতেই হবে।'

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কোকে তৈরি হয়ে আসতে বলল। বিস্কো তরোয়াল নিয়ে এল আর শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে এল। মারিয়াও ভালো পোশাক পরে তৈরি হয়ে এল। মারিয়ার যাওয়ার ব্যাপারে ফ্রান্সিস দু'একবার আপত্তি জানাল। কিন্তু মারিয়া জেদ ধরল ও ওদের সঙ্গে যাবেই। অগত্যা ফ্রান্সিস আর আপত্তি করল না।

জাহাজের গায়ে ঝোলানো একটা শক্তপোক্ত নৌকো জলে নামানো হলো। দড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নৌকোয় নেমে এল। মারিয়াকে নামানো হলো দড়ির জালে দাঁড় করিয়ে। খাবার-দাবার, খাওয়ার জল এসব প্রয়োজনীয় জিনিস আগেই নৌকোয় রাখা হয়েছিল আর দু'টো জল রাখবার খালি পিপে। মারিয়া নেমে আসতেই বিস্কো নৌকো ছেড়ে দিল। বিস্কো আর শাঙ্কো নৌকো বাইতে লাগল তীরভূমি লক্ষ্য করে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই নৌকো তীরে ভিড়ল। ফ্রান্সিসরা নামল। মারিয়া কিন্তু কারো সাহায্য ছাড়াই নৌকো থেকে লাফিয়ে নামল। সবাই বিস্তীর্ণ বেলাভূমির বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

অনেকটা হাঁটার পর ওরা থামল। দেখল যতদূর চোখ যায় শুধু ধুধু বালির প্রান্তর। ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল।

সাদা-ধূসর রঙের বালি। কোনোদিকে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। দু'একটা পাখি মাঝে মাঝে বালিতে ছায়া ফেলে উড়ে যাচ্ছে। তীব্র রোদ—বালিতে প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে লাগছে। ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ। গরম হাওয়া বইছে।

কিছুক্ষণ চলার পর ওদের নজরে পড়ল ক্ষয়িত শিলার কালচে পাহাড়। বেশি উঁচু নয়। তার ওপাশে কিছু সবুজ গাছগাছালির মাথা দেখা গেল। ফ্রান্সিস আশ্বস্ত হলো—যাক মরুভূমির মতো জায়গাটা খুব দূরবিস্তৃত নয়।

টানা পাহাড়ের কাছে এল ওরা। পাথরে পা রেখে রেখে ওরা পাহাড়টায় উঠল। দেখল ওপাশে একটু দূর থেকে বনভূমি শুরু হয়েছে। খুব ঘন বন নয়। ছাড়া ছাড়া। দূরে কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। ছাইকাদা দিয়ে গেঁথে গেঁথে তৈরি বাড়ি। ছাদ পেইকো ঘাসের। ফ্রান্সিস বলল—'মানুষের বসতি আছে দেখছি। চলো ওখানেই জলের খোঁজ করা যাক।' ওরা পাথরের চাঁইয়ে পা রেখে রেখে নামতে লাগল। ফ্রান্সিস অবশ্য মারিয়াকে হাত ধরে সাহায্য করতে লাগল। মারিয়া প্রায় নেমেই এসেছিল, হঠাৎ একটা পাথরের টুকরোয় পা রাখতে টুকরোটা সরে গেল। মারিয়া টাল সামলাতে পারল না। পাথরের চাঁইয়ের মাথা থেকে নিচে পড়ে গেল একটা বড় গহ্বরের মধ্যে। ভাগ্য ভালো—নিচে ছিল বালি। মারিয়ার বালির ওপর দু'পা পড়ল। ওর শুধু হাতটা একটু ছড়ে গেল। পাথরের চাঁইয়ের ধারে এসে ফ্রান্সিসরা হাঁটু গেড়ে বসে নিচে তাকাল। গহ্বরটা একটু অন্ধকারই, তবু দেখল মারিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস ডেকে বলল—'মারিয়া—তোমার কি খুব লেগেছে?'

মারিয়া হেসে বলল—'কিছুছু না।'

—এবার ফ্রান্সিস অন্যদের দিকে তাকাল। বলল—'এখন মারিয়াকে তোলা যায় কী করে?'

—'জাহাজ থেকে দড়ি আনতে হবে।' বিস্কো বলল।

ওদিকে মারিয়া গহ্বরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটু অন্ধকার হলেও পাথুরে দেয়াল খোঁদল এসব দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গুহার মুখ। মুখটা বেশ বড়। একজন মানুষ মাথা উঁচু করে ঢুকতে পারবে। মারিয়া আস্তে আস্তে গুহাটার মুখে এসে দাঁড়াল। দেখল কাঠের ফালি দিয়ে তৈরি একটা দরজা গুহার মুখটায়। তার মানে এই গুহায় নিশ্চয়ই মানুষ থাকে। তাহলে এই গহ্বর থেকে বেরোবার পথও নিশ্চয়ই আছে। মারিয়া চারদিকে ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু পথ কোথায়? চারদিকেই পাথরের অমসৃণ গা। হঠাৎ একটা জায়গায় দেখল যেন ওখানে অন্ধকারটা কম। মারিয়া দ্রুতপায়ে সেখানে এল। দেখল দু'টো পাথরের চাঁইয়ের মাঝখানে একটা ফাটল। মারিয়া বালির ওপর হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর বালির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ফাটলের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তার মানে এই গুহায় যে বা যারা থাকে তারা এই পথেই যাতায়াত করে। লুকিয়ে থাকার পক্ষে ভালো জায়গা।

মারিয়া বাইরে পাথরের চাঁইয়ের নিচে এসে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে ডাকল—'ফ্রান্সিস।' বিস্কো তখন জলের খালি পিপে রেখে জাহাজ থেকে দড়ি আনতে যাবে বলে তৈরি হচ্ছে। তখনি মারিয়ার ডাক ওদের কানে গেল। ওরা তাড়াতাড়ি পাথরের চাঁই থেকে নেমে এল। দেখল মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া বলল—'এই গহ্বরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার পথ আছে।'

—ভালোই হলো,' ফ্রান্সিস বলল—'আমরা তোমাকে দড়ি দিয়ে তুলবো ভাবছিলাম।'

—'ফ্রান্সিস—এর ভেতরে একটা গুহা আছে। গুহার মুখে কাঠের দরজা আছে। মনে হয় মানুষ বাস করে।' মারিয়া বলল।

—'বলো কি!' ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হলো।

বিস্কো বলল—'চলো না ফ্রান্সিস—দেখা যাক।'

সবাই হামাগুড়ি দিয়ে ফাটল পেরোল। গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। ফালি কাঠের দরজাটা একটুকরো দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। ফ্রান্সিস খুলল দড়িটা। তারপর একে একে সবাই গুহাটায় ঢুকল। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। চোখে অন্ধকার ভাবটা সয়ে আসতে ওরা দেখল—গুহার একপাশে শুকনো ঘাসের বিছানা। তার ওপর মোটা কাপড়ের কম্বলমতো পাতা। অন্য পাশে পোড়া হাঁড়িকুড়ি, পাথরের টুকরো পেতে উনুন। একপাশে এলগারোবো গাছের বাঁকা কাণ্ড কুঁদে কুঁদে তৈরি বিচিত্র সব মূর্তি। এসব কী মূর্তি ফ্রান্সিসরা বুঝল না। আবার মা-ছেলে, বিয়ের বর-কনে এসবের মূর্তিও আছে। ওরা বুঝল এখানে একজন মানুষই থাকে। বিছানায় একটা মাত্র ঢিলেঢালা পোশাক পঞ্চো পড়ে আছে। সব দেখেটেখে ফ্রান্সিস বলল—'চলো, আর কিছু দেখার নেই। তবে লোকটাকে পেলে এখানে

জলের সন্ধান পাওয়া যেত।'

ওরা গুহার বাইরে আসতেই একজন মধ্যবয়স্ক লোকের মুখোমুখি পড়ল। লোকটা ভীষণভাবে চমকে উঠল। ও বোধহয় ওর গোপন আস্তানা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল। লোকটা দ্রুত পেছন ফিরল। পালাবার ধান্ধা। বিস্কো জোরে ছুটে গিয়ে লোকটার ঢিলেঢালা পোশাক পঞ্চোটা পেছন থেকে চেপে ধরল। লোকটার পালানো হলো না। বিস্কো লোকটাকে ধরে ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে এল। লোকটা বেশ ভয় পেয়ে গেছে বোঝা গেল। লোকটা কাছে আসতে ফ্রান্সিস হেসে হাত তুলে ওকে ভয় না পেতে ইঙ্গিত করল। লোকটা যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো। ফ্রান্সিস কথা বলতে গিয়ে সমস্যায় পড়ল। কী ভাষা বুঝবে লোকটা? ফ্রান্সিস প্রথমে পোর্তুগীজভাষায় জিজ্ঞেস করল—'তোমার নাম কী?' লোকটা বুঝল না। তাকিয়ে রইল। এবার ফ্রান্সিস স্প্যানিশ ভাষায় বলল—'তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার নাম বলো।' লোকটার চোখমুখ উজ্জ্বল হলো। বোঝা গেল ও ফ্রান্সিসের কথা বুঝেছে। লোকটা ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় বলল,—'আমি মেস্তিজো—চিকামাদের দেবতার পূজারী।'

ফ্রান্সিস এবার ভালোভাবে মেস্তিজোকে দেখল। মেস্তিজোর মাথায় লম্বা লম্বা চুল। মুখের দু'পাশের আধখানায় হলুদ রঙ মাখা। দু'কানের লতিতে সোনার কাঠি বেঁধানো। পরনে ঢিলেঢালা পঞ্চো পোশাক। ওর একহাতে একটা ঘাসের তৈরি ঝুড়ি। তাতে ক্যারোপ বীনএর বেশ কয়েকটা রুটি। অন্য হাতে একটা চীনেমাটির কুঁজো মতো। বোঝা গেল খাবার জল তাতে। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো যে মেস্তিজোর হাতে অস্ত্র নেই। তার মানে সে যোদ্ধা নয়। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো, তোমার কোন ক্ষতি আমরা করবো না। আমাদের জাহাজ সমুদ্রতীরে রয়েছে। আমরা পানীয় জল নিতে এসেছি। তুমি পানীয় জলের জায়গাটা দেখিয়ে দাও।' ফ্রান্সিস কথাগুলো থেমে থেমে বলল যাতে মেস্তিজো সহজে বুঝতে পারে।

মেস্তিজো মাথার লম্বা লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বলল—'চলো—জলের জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি।' ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—'তাহলে তোমরা ওর সঙ্গে যাও। জল নিয়ে এসো।'

মেস্তিজো হাতের খাবারের ঝুড়ি জলের কুঁজো ওর গুহাঘরে রেখে এল। তারপর জলের জায়গা দেখাতে চলল। পেছনে পিপে নিয়ে বিস্কো ও শাঙ্কো চলল। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া—চলো আমরা গুহাঘরে গিয়ে



চিমু সেনাদের নিয়ে মোচিকা সাম্রাজ্য আক্রমণ করল।

বসি।' দু'জনে এসে ফালি কাঠের দরজা খুলে গুহায় ঢুকল। খড়ের বিছানায় গিয়ে বসল দু'জনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্কোরা পিপে ভর্তি জল নিয়ে ফিরে এল। এদিকে বেশ বেলা হয়ে গেছে। সকলেরই খিদে পেয়েছে। জাহাজ থেকে খাবারদাবার আনা হয়েছিল। মারিয়া সে সব খাবার সবাইকে ভাগ করে দিল। মেস্তিজোকেও দেওয়া হলো। মেস্তিজো খুব খুশি। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো—আমি তোমার খাবার খাবো। তুমি আমাদের খাবার খাও।'

মারিয়াও মেস্তিজোর খাবার খেতে চাইল। মেস্তিজো ঘাসের তৈরি ঝুড়ি থেকে রুটি, সামুদ্রিক মাছ, বীন, লঙ্কামেশানো আলুর তরকারি বের করে দিল। ফ্রান্সিস মারিয়া খেতে লাগল। নতুন ধরনের খাবার দু'জনেরই ভালো লাগল।

খাওয়াদাওয়ার পর মেস্তিজো বিছানায় পাতা কাপড় তুলে খড়গুলো গুহার মেঝেয় আরও জায়গায় ছড়িয়ে দিল। তারপর দু'টো কম্বলমতো মোটা কাপড় পেতে দিল। ফ্রান্সিসরা সবাই বসল তাতে। শাঙ্কো শুয়ে পড়ল, বিস্কো আধশোয়া হলো। ফ্রান্সিস, মারিয়া আর মেস্তিজো বসে রইল। এতক্ষণ ফ্রান্সিস ভাবছিল—মেস্তিজোর কথা। স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে অথচ আচার আচরণে মোটেই স্পেনীয়দের মতো নয়। ওর আসল পরিচয়টা কী? এই গোপন গুহাঘরে লুকিয়ে থাকে কেন? ফ্রান্সিস ডাকল—'মেস্তিজো?'

—'বলুন।'

—'দেখ, তোমার ভাষা শুনে বুঝছি তুমি স্পেনীয়। অবশ্য তোমার কথা কিছুটা ভাঙা ভাঙা তবু ভাষাটা তো স্পেনীয়। তাছাড়া তুমি আমার স্পেনীয় ভাষাও বুঝতে পারছো। অথচ তোমার এখনকার চেহারা মোটেই স্পেনীয়দের মতো নয়। কী ব্যাপার বলো তো?' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো আস্তে আস্তে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলতে লাগল—'সে অনেকদিন আগের কথা। আমার বয়েস তখন ছয় সাত। স্পেনের ডিমেলো শহরে বাবা-মার সঙ্গে থাকতাম এটুকু আমার মনে আছে। বাবা মালবাহী জাহাজে কাজ করতেন। তখন একবার বাবা-মার সঙ্গে আমিও সমুদ্রযাত্রায় বেরোলাম। মাস চার পাঁচ জাহাজেই কাটল। ঝড়-ঝাপ্টায় আমাদের

জাহাজ বার কয়েক প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে আমরা বেঁচে থেকেছি। জাহাজ ডোবেনি। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না।

যে সমুদ্রতীরে আপনাদের জাহাজ নোঙর করা তার তীরভূমিকে বলে চালা। এই চালাকে প্রায় মরুভূমিই বলা যায়। এই চালার কাছাকাছি এসে আমাদের জাহাজ পড়ল এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে। প্রায় আশীজন নাবিক প্রাণপণ লড়াই করল ঝড়ের সঙ্গে। তাদের মধ্যে বাবাও ছিলেন। শেষপর্যন্ত জাহাজ ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। গভীর ঝড়ো সমুদ্রে ছিটকে পড়লাম আমি। ভাঙা জাহাজের একটা লম্বা কাঠের টুকরো পেলাম হাতের কাছে। পাল খাটাবার ছেঁড়া দড়ি বাঁধা ছিল কাঠটায়। আমি কোনোরকমে সেই দড়ি দিয়ে কাঠের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললাম। তারপর কী হলো জানি না। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম দেখি এই চালার সমুদ্রতীরে বালির মধ্যে কাঠেবাঁধা অবস্থায় আমি পড়ে আছি। তখন সূর্য উঠেছে। মাথাটা পাথরের মতো ভারী। সেই অবস্থায় পড়ে রইলাম। রোদের তেজ বাড়ল। শরীরটা গরম হলো। উঠে মরুভূমির মতো উত্তপ্ত বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কী কষ্টে আর কী অবস্থায় যে চিকামা উপত্যকায় পৌঁছালাম তা আজ আর বলতে পারবো না.....

যাহোক—এই চিকামা উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল মোচিকা সাম্রাজ্য। রাজধানীর নাম চিকামা। এখানকার অধিবাসীদের বলা হয় উনকা। কারণ এরা উনকা ভাষায় কথা বলে। উনকাদের রাজার নাম কোলা। কী করে রাজপুরোহিত ল্লামার সুনজরে পড়লাম জানি না। ল্লামাই আমাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে লাগল।' মেন্তিজো থামল।

ফ্রান্সিস বলল—'তারপর?'

—'বেশ চলছিল। কিন্তু মোচিকা সাম্রাজ্যের বিপদ ঘনিয়ে এল। এই মোচিকা সাম্রাজ্যের উত্তরে হলো চিমু সাম্রাজ্য। সেই সাম্রাজ্যের রাজার নাম লুপাকা। লুপাকা খুব কঠিন হৃদয়ের মানুষ। পাহাড়ী উপজাতিদের একত্রিত করে সে এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল। মাস তিনেক আগে সে চিমু সেনাদের নিয়ে মোচিকা সাম্রাজ্য আক্রমণ করল। হিংস্র দুর্ধর্ষ সেই সেনাবাহিনীর কাছে রাজা কোলা হেরে গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলেন। লুপাকা মোচিকা সাম্রাজ্য দখল করল। চিকামায় রাজা হয়ে বসল। তার অত্যাচারে উনকাদের দুর্দশা চরমে উঠল।'

—'তারপর?'

—'এবার চিকামার কথা বলি। এখানে এক উঁচু পাথরের স্তূপের ওপর উনকাদের দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। নিখাদ সোনায় তৈরি সেই দেবমূর্তি কতদিন আগে তৈরি হয়েছিল কেউ জানে না। নানারকম রঙবেরঙের দামী পাথরের কাজ সেই মূর্তিতে। সেই দেবমূর্তিকে উনকারা বলে হুয়াকা। প্রতিদিন হুয়াকার পূজো হয়। মাঝে মাঝে উৎসবও হয়।' মেন্তিজো থামল। আঙুল দিয়ে গুহার প্রায় অন্ধকার কোণায় রাখা একটা কাঠের মূর্তি দেখাল। বলল—'ঐ যে হুয়াকার কাঠের মূর্তি। নকল।'

ফ্রান্সিসরা তাকাল।

—হুয়াকা দেবতার মূর্তি দেখতে এইরকম—



—'আসল মূর্তিটা কত উঁচু?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'হাত আড়াই তিনেক। রাজপুরোহিত ল্লামা শুধু পুজোই করত না। পাথর,এলগারোবো গাছের আঁকাবাঁকা কাণ্ড কুঁদে মূর্তিও বানাতো। আমিও তার কাছে এই কাজ শিখেছিলাম। এগুলো সব আমার তৈরি।'

—'এবার তোমার কথা বলো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'লুপাকা এসে এখানে উনকাদের কাছে যত সোনা অলঙ্কার দামী পাথর পেল সব কেড়ে নিল। মাস দু'য়েক কাটল। একদিন রাজা লুপাকা হুয়াকা স্বর্ণমূর্তি নিজের চিমু রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইল। হুয়াকাভক্ত উনকাদের কোনো আপত্তিই সে গ্রাহ্য করল না। সৈন্যরা স্বর্ণমূর্তি নামিয়ে আনতে গেল। তখনই ধরা পড়ল যে, যে মূর্তিটা রাখা আছে সেটা সোনার নয় কাঠের। এত সুন্দর রঙ মিলিয়ে তৈরি যে কারো বোঝবার উপায় ছিল্ না। রাজা লুপাকা ভীষণ ক্ষেপে গেল। আসল স্বর্ণমূর্তি তাহলে কে সরিয়েছে? কে লুকিয়ে রেখেছে সেই স্বর্ণমূর্তি? রাজা লুপাকার যত রাগ গিয়ে পড়ল রাজপুরোহিত ল্লামার ওপর। ল্লামার সঙ্গে তার শিষ্য আমাকেও বন্দী করা হলো। ভীষণ অত্যাচার চলল ল্লামার ওপর। ল্লামা বলল — রাজা কোলার নির্দেশেই সে আসল স্বর্ণমূর্তির মতো একটি কাঠের মূর্তি তৈরি করেছিল। সেটা নিয়ে রাজা কোলা কী করেছেন তা সে জানে না। রাজা লুপাকার রক্ষীদের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে রাজপুরোহিত ল্লামা কয়েদঘরেই মারা গেল আমার কোলে মাথা রেখে।' মেন্তিজো থামল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ আধশোয়া হয়ে মেন্তিজোর কথা শুনছিল। স্বর্ণমূর্তির রহস্যের কথা শুনেই ও সোজা হয়ে বসল। বলল—'বোঝাই যাচ্ছে রাজা কোলা আশঙ্কা করেছিলেন যে রাজা লুপাকা তাঁর দেশ আক্রমণ করতে পারে। তাঁর পরাজয় হতে পারে। যুদ্ধে জিতেও যাতে রাজা লুপাকা স্বর্ণমূর্তি নিয়ে নিজের দেশে যেতে না পারে তার জন্যে তিনি নকল হুবহু একরকম দেখতে একটা কাঠের মূর্তি ল্লামাকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন।'

—'ঠিক বলেছেন।' মেন্তিজো বলল।

—'এখন প্রশ্ন হলো রাজা কোলা সেই আসল স্বর্ণমূর্তি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন?' ফ্রান্সিস বলল।

—'তার হদিস কেউ জানে না।' মেন্তিজো বলল—'রাজা লুপাকা এখন হন্যে হয়ে সেই আসল স্বর্ণমূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর ঘাসের বিছানা থেকে উঠে নকল কাঠের মূর্তিটার কাছে গেল। ভালো করে দেখল। বলল—'মেন্তিজো, রাজপুরোহিত কি এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিতই তোমাকে দিয়ে যেতে পারেনি?'

—'না, স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। তবে রাজা কোলাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল — এই নকল কাঠের মূর্তি তিনি কেন তৈরি করছেন?'

মেস্তিজো বলল।

—'তার উত্তরে রাজা কোলা কী বলেছিলেন?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'শুধু হেসে বলেছিলেন—সবই কপালের লিখন।' মেস্তিজো বলল।

—'সবই কপালের লিখন—'কথাটা ফ্রান্সিস বার কয়েক বিড়বিড় করে বলল। কী অর্থ কথাটার? ফ্রান্সিস গুহার পাথুরে মেঝেয় কয়েকবার পায়চারি করল। বিস্কো বলল—'ফ্রান্সিস,ব্যাপারটা কি তোমার কাছে রহস্যময় লাগছে?'

—'অবশ্যই—' ফ্রান্সিস পায়চারি থামিয়ে বলল—'আর আমি স্থির করে ফেলেছি ঐ স্বর্ণমূর্তি খুঁজে বের করতে আমি চিকামা উপত্যকায় যাবো।'

—'পারবে খুঁজে বের করতে?' মারিয়া বলল।

—'আগে নকল মূর্তিটা দেখি। চারপাশ ভালো করে দেখি, তবেই বুঝতে পারবো মূর্তি উদ্ধার করতে পারবো কিনা।' ফ্রান্সিস বলল। এবার ফ্রান্সিস মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে বলল—'তুমি এই গুহাঘরে লুকিয়ে আছো কেন?'

—'গুরুদেব ল্লামা মারা যাওয়ার পর রাজা লুপাকা আমার ওপর অত্যাচার শুরু করে—'মেস্তিজো বলল—'কোনোরকমে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে আছি।'

—'তুমি রাজা লুপাকাকে কী বলেছো?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'ঐ যে কথাটা রাজা কোলা ল্লামাকে বলেছিলেন—সবই কপালের লিখন।'

—'হুঁ।' ফ্রান্সিস কপাল কুঁচকে ভাবল একটুক্ষণ। বলল—'রাজা লুপাকা বোধহয় কিছুই বোঝেনি।'

—'না। এই জন্যেই তো আমার ওপর রাগ। এখানে লুকিয়ে থাকি। আমি তো রাজপুরোহিত ল্লামার সহকারী ছিলাম। তাই উনকারা আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। আমার জন্যে খাবার লুকিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কখনো আমিও খাবার আনতে যাই।' মেস্তিজো বলল।

—'তুমি তো উনকাভাষা জানো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'অনর্গল বলতে পারি।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস বিস্কোদের দিকে তাকাল। বলল—'বিস্কো, শাঙ্কো—বিকেল হয়ে গেছে। তোমরা অস্ত্রশস্ত্র এখানে রেখে জল নিয়ে জাহাজে চলে যাও। বন্ধুদের গিয়ে বল—আমরা চিকামা যাবো। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করবো। ওরা যেন দিন দশপনেরো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে। ততদিনে আমরা না ফিরলে ওরা যেন সশস্ত্র হয়ে চিকামায় যায়। সব বলে তোমরা দু'জন ফিরে এসো।'

—'বেশ—'বিস্কো বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কোও উঠল। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া, তুমি ওদের সঙ্গে জাহাজে ফিরে যাও।'

মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'না, আমিও তোমাদের সঙ্গে চিকামা যাবো।'

—'বেশ,চলো—' ফ্রান্সিস বলল—'আমরা কিন্তু বেড়াতে যাচ্ছি না। যে কোনো মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারি।'

—'আমি ভয় পাই না।' মারিয়া দৃঢ়স্বরে বলল।

বিস্কো আর শাঙ্কো সন্ধ্যের আগেই জলের পিপে নিয়ে জাহাজে চলে গেল। গুহাঘরটা একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেল। মেস্তিজো চকমকি ঠুকে পাথরের খাঁজে রাখা একটা মশাল জ্বালাল। মশালটা সামুদ্রিক মাছের তেলে ভেজানো ছিল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে আর মারিয়াকে শোনাচ্ছিল ওর চিকামায় কাটানো জীবনের কথা। ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনছিল। ওর এত মনোযোগ দিয়ে শোনার উদ্দেশ্য যদি স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

একটু রাতে বিস্কো আর শাঙ্কো ফিরে এল। বলল—'বন্ধুরা সবাই ফ্রান্সিসের কথা মন দিয়ে শুনেছে। ওরা খুশি হয়েছে ফ্রান্সিস আর এক অভিযানে যাচ্ছে শুনে।' ওরা জাহাজ থেকে খাবার এনেছিল। রাতের খাওয়ার পর ওরা শুকনো ঘাস ছড়ানো বিছানায় শুয়ে পড়ল।

গভীর রাত তখন। দূরের সমুদ্রের মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ কিসের শব্দে মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ও আর কোনো শব্দ হয় কি না শোনার জন্যে কান পেতে রইল। আবার শব্দ হলো। দু'চারটে পাথরের টুকরো বাইরে চাঁই পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। ও ফ্রান্সিসকে ফিসফিস করে ডাকল—'ফ্রান্সিস, ফ্রান্সিস।' ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—'শুনেছি। আসার পথে ধূসর রঙের শেয়াল দেখেছিলাম। বোধহয় শেয়ালের পাল, খাবারের ধান্ধায় এসেছে।'

ঠিক তখনই কাঠের ফালিতে তৈরি গুহাঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো। স্পষ্ট শব্দ। ফ্রান্সিস বিপদ আঁচ করল। একলাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে তরোয়ালটা নিয়ে চাপাস্বরে ডাকল—'বিস্কো—শাঙ্কো।'

বিস্কো শাঙ্কো তখনও ঘুমে অচেতন। মারিয়া ওদের জোরে ধাক্কা দিল। দু'জনেই দ্রুত উঠে বসল। ততক্ষণে কয়েকজন লোক এসে গুহাঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে। মশালের আলোয় দেখা গেল—লোহার ছুঁচলো মুখওয়ালা বর্শা। সকলের হাতেই বর্শা। বর্শা ছোঁড়ার জন্যে উঁচিয়ে ধরল ওরা। লোকগুলো বেঁটে। শক্ত-সমর্থ। গায়ের রঙ হালকা তামাটে। মাথার চুল লম্বা। কপালে লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। তাতে পাখির পালক গোঁজা। পরনে ঢিলেঢালা পোশাক—পঞ্চো। মুখের দুপাশে লাল রং মাখা। শাঙ্কো দ্রুত তীর ধনুকের দিকে হাত বাড়াল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—'শাঙ্কো, আগেই লড়াই নয়।' ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে দিল। মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে দেখল ভয়ে মেস্তিজোর মুখ সাদা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো এরা কারা?'

—'রাজা লুপাকার সৈন্য। আমাকে ধরলে ওরা মেরে ফেলবে।' সৈন্য ক'জন কিন্তু ফ্রান্সিসদের আর মারিয়াকে দেখে অবাক। সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে বলশালী লোকটা ভারীগলায় কী বলে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো—এরা যা বলবে আমাকে তা বলো।'

—'ও দলনেতা। বলছে—তোমরা কে?' মেস্তিজো বলল।

—'বলো, আমরা ভাইকিং। রাজা কোলার লুকোনো স্বর্ণমূর্তি আমরা খুঁজে বের করতে এসেছি। আমরা লড়াই চাই না।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো উনকা ভাষায় কথাগুলো দলনেতাকে বলল। দলনেতা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কী ভাবল। তারপর মাথা তুলে কী বলল। মেস্তিজো বলল—'দলনেতা বলছে, ওরা আমার খোঁজে এসেছিল। কিন্তু আপনারা বিদেশী। আপনাদেরও ও বন্দী করবে। রাজা লুপাকার কাছে নিয়ে যাবে। তারপর রাজা লুপাকা যা করবার করবে।'

—'খুব ভালো কথা। কিন্তু মেস্তিজো, ওকে বলো আমাদের কারো যেন কোনো ক্ষতি না হয়।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো কথাটা দলনেতাকে বলল। দলনেতা মাথাটা দু'পাশে নাড়ল। বোধহয় কথাটা মেনে নিল। দলনেতার ইঙ্গিতে একজন সৈন্য নিজের কোমরে জড়ানো কালো রঙের লম্বা দড়ি বের করল। সেই দড়ি দিয়ে প্রথমে মেস্তিজো তারপর মারিয়ার হাত বাঁধা হলো। তারপর ফ্রান্সিসদের হাত বাঁধা হলো। আর একজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের তরোয়াল শাঙ্কোর তীর ধনুক নিল। শাঙ্কো ওদের চোখের আড়ালে বড় ছোরাটা ঢোলা জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

গুহাঘর থেকে সবাই বাইরে এল। দু'জন

সৈন্য মশাল হাতে সামনের দিকে চলল। পেছনে দলনেতা, অন্য সৈন্য আর ফ্রান্সিসরা চলল।

পাহাড়ী এলাকা পোরোতেই পুব আকাশ লাল হলো। একটু পরেই সূর্য উঠল। দেখা গেল এদিকটায় বালির চিহ্নমাত্র নেই। চারিদিকে সবুজ গাছগাছালি। বীন, তুলো আলুর ক্ষেত। মাঝে মাঝে দু'চারটে পাথরগাঁথা বাড়ি। পেইকো ঘাসের ছাউনি। সেসব বাড়ি থেকে পুরুষ স্ত্রীলোক বাচ্চাকাচ্চারা বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। বিশেষ করে হলদে গাউনপরা মারিয়াকে। ওদের পরনে মোটা সুতোর হাতে তৈরি ঢোলা পোশাক। পোশাকে নানা রঙের সুতোর কাজ।

ধুলোটে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই চিকামা পৌঁছল। দেখা গেল দুটো সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের উপত্যকায় চিকামা নগর। এখানে জনবসতি বেশি। পাথরের বাড়িঘরও অনেক। চিকামার অধিবাসীরাও অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। মারিয়ার পোশাক দেখে ওরা আশ্চর্য হলো বেশি।

একটা পাথরের লম্বাটে ঘরের সামনে এসে দলনেতা দাঁড়াল। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন সৈন্য গিয়ে ঘরটার কাঠের দরজায় লাগানো একটা বড় হুক টেনে খুলল। দলনেতা ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢোকার জন্যে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। ঘরে ঢুকেই ফ্রান্সিস বুঝল এটা কয়েদঘর। হাত বাঁধা অবস্থায় প্রায় আটদশজন লোক ঘরটায় শুয়ে বসে আছে। ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে সঙ্গে সঙ্গে বলল—'দলনেতাকে বলো, আমাদের কেন কয়েদঘরে রাখা হচ্ছে?' মেস্তিজো ভয়ে ভয়ে সে কথা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দলনেতাকে বলল। দলনেতার উত্তরটা ফ্রান্সিসকে বলল—'দলনেতা বলছে, ও রাজাকে সব বলবে। তারপর আপনাদের রাজসভায় রাজার সামনে উপস্থিত করবে। রাজা যা করবার করবেন। ততক্ষণ কয়েদঘরেই থাকতে হবে।' অগত্যা ফ্রান্সিসদের এই বন্দীজীবন মেনে নিতেই হলো।

দুপুরের দিকে কয়েদঘরের রক্ষীরা বড় বড় পাতা পেতে ফ্রান্সিসদের খেতে দিল। হাত খুলে দিল। ওরা খেতে লাগল। ফ্রান্সিসরা বন্দীদশায় যেমন বরাবর বলে তেমনি বলল—'পেট ভরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও। শরীরটা ঠিক রাখো।' মেস্তিজোর গুহাঘরে যে খাবার ফ্রান্সিস আর মারিয়া খেয়েছিল তেমনি খাবার। খুব সুস্বাদু না হলেও খাবার অন্যরকম বলেই ভালো লাগল। ফ্রান্সিস চেটেপুটে খেল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই সৈন্যদের দলনেতা সেই বেঁটে বলশালী লোকটা এল। মেস্তিজোর সঙ্গে কী কথা হলো। মেস্তিজো বলল—'ফ্রান্সিস, চলো, রাজা আমাদের ডেকেছেন। রাজসভায় যেতে হবে।'

হাতবাঁধা অবস্থাতেই ওরা দলনেতার পেছনে পেছনে চলল। রাস্তার দু'ধারের লোকজন বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে ওদের দেখতে লাগল। রাস্তার পাশ থেকে হঠাৎ একজন পুরুষ ও একজন নারী ছুটে এসে মেস্তিজোকে মাথা নিচু করে দু'হাত বুকে রেখে বোধহয় শ্রদ্ধা জানাল। সৈন্যরা ঐ দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বুঝল—মেস্তিজো রাজপুরোহিতের শিষ্য ছিল। ওকে উনকারা এখনও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু রাজা লুপাকার সৈন্যদের ভয়ে এগিয়ে এসে শ্রদ্ধা জানাতে সাহস পাচ্ছে না।

রাজবাড়িটা বেশ উঁচু, বড় ও পাথরের তৈরি। পাথরের ছাদ। ওরা রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল। একটু অন্ধকারমতো ভেতরটা। দিনের বেলায়ও পাথুরে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। রক্ষীরা লোহার ছুঁচোলোমুখ বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে।

একটু এগোতেই ফ্রান্সিসরা দেখল রাজসভা চলছে। একটা পাথরের সিংহাসনে রাজা লুপাকা বসে আছে। দু'পাশে আরো কয়েকটা পাথরের ছোট আসনে বোধহয় মন্ত্রী গণ্যমান্যরা বসে আছে। রাজা বেঁটে। বয়েস হয়েছে। তবু বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মাথার চুল লম্বা। কপালে চকচকে কাপড়ের হলুদ রঙের ফেট্টি। তাতে সুন্দর লম্বা লম্বা পালক গোঁজা। দুকানের লতিতে সোনার কাঠি গাঁথা। গায়ে পঞ্চো। তবে পঞ্চোর কাপড় মোটা নয়। পাতলা। মুখের অর্ধেক অংশে লাল রঙ মাখা।

ফ্রান্সিসরা যখন পৌঁছল তখন একটা বিচার চলছিল বোধহয়। রাজা বোধহয় রায় দিল। বিচারপ্রার্থীরা মাথা নুইয়ে বুকে দু'হাত রেখে সম্মান জানিয়ে চলে গেল। দলনেতা মাথা নুইয়ে দু'হাত বুকে রেখে সম্মান জানিয়ে কী বলে গেল। রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস রাজার কঠিন মুখ দেখে আর ধূর্ত চাউনি দেখে বেশ চিন্তায় পড়ল। একে কি বোঝানো যাবে? তবে সোনা মণিমাণিক্যের লোভ বড় সাংঘাতিক। সেই লোভেই রাজা হয়তো ওদের কোনো বিপদে ফেলবে না।

এবার রাজা আর ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। মেস্তিজো দোভাষীর কাজ করতে লাগল।

রাজা—'তোমরা ভাইকিং?'

ফ্রান্সিস—'হ্যাঁ।'

রাজা মারিয়াকে দেখিয়ে বললো—'এ কে?'

ফ্রান্সিস—'রাজকুমারী মারিয়া। আমার স্ত্রী।'

রাজা—'তোমাদের সব কথা শুনলাম। পারবে গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে?'

ফ্রান্সিস—'সবকিছু দেখবো আগে, যতটা সম্ভব খবর সংগ্রহ করবো তারপর বলতে পারবো।'

রাজা—'বেশ, দ্যাখো চেষ্টা করে।

ফ্রান্সিস—'এর জন্যে আমাদের মুক্তি দিতে হবে। সব জায়গায় অবাধে ঘুরতে দিতে হবে।'

রাজা—'বেশ, কিন্তু মারিয়াকে রাজপ্রাসাদে রাখা হবে।' কথাটা বলে রাজা মৃদু হাসল। ফ্রান্সিস বুঝল ওরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তাই মারিয়াকে নজরবন্দী রাখা হবে।

ফ্রান্সিস—'বেশ।'

এবার রাজা মেস্তিজোর দিকে তাকাল। রাগে রাজার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। ভয়ে মেস্তিজো বেশ কাঁপতে লাগল। চীৎকার করে রাজা কী বলে উঠল। একজন রক্ষী ছুটে এসে মেস্তিজোকে ধরল। ভয়ে মেস্তিজো কাঁদতে লাগল। মেস্তিজোকে টেনে হিঁচড়ে রাজার সামনে দাঁড় করানো হলো। আর একজন রক্ষী লম্বা চাবুক হাতে এগিয়ে এল। কোনো সামুদ্রিক মাছের সরু লেজ দিয়ে তৈরি চাবুকটা। চাবুকটার গায়ে ছোট ছোট কাঁটা। রক্ষী নির্মম হাতে চাবুক চালাল মেস্তিজোর গায়ে। মেস্তিজো যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল। দেখা গেল পিঠে যেখানে চাবুকের ঘা পড়েছে সে জায়গা থেকে পাঞ্চোতে রক্ত ফুটে উঠেছে। রাজা আবার চীৎকার করে কী বলে উঠল। মেস্তিজো বারবার মাথা নোয়াতে লাগল আর মুখে কী বলতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল রাজা মেস্তিজোর কাছে গুপ্ত স্বর্ণমূর্তির হদিস জানতে চাইছে। আবার চাবুক আছড়ে পড়ার আগেই ফ্রান্সিস ডান হাত তুলে মেস্তিজোর কাছে এসে দাঁড়াল। আবার রাজা আর ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। মেস্তিজো কাঁপা কাঁপা গলায় দোভাষীর কাজ করতে লাগল।

ফ্রান্সিস—'মেস্তিজোকে মুক্তি দিতে হবে।'

রাজা—'না, ও স্বর্ণমূর্তির খোঁজ জানে।'

ফ্রান্সিস—'না, ও জানে না। ও যা জানে সব আপনাকে বলেছে।'

রাজা—'না, ওকে মুক্তি দেওয়া হবে না।

ফ্রান্সিস—'তাহলে স্বর্ণমূর্তির সন্ধান আমরা করবো না। আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।'

রাজা ভুরু কুঁচকে কী ভাবল। তারপর বলল—'যদি মেস্তিজো পালিয়ে যায়?'

ফ্রান্সিস—'ওর দায়িত্ব আমাদের। ও পালিয়ে গেলে আমরা যে কোনো শাস্তি মেনে নেব।'

রাজা লুপাকা ভেবে দেখল যে ল্লামা মরে গেল, মেস্তিজো এত অত্যাচারেও কিছুই বলতে পারছে না, নিজেরা অনেক চেষ্টা করেও স্বর্ণমূর্তির হদিস করতে পারেনি—এখন যদি এই ভাইকিংরা হদিস বার করতে পারে করুক না। বিদেশী বিধর্মী এরা। কাজ ফুরুলে মেরে ফেলাও যাবে।

—'বেশ।' রাজা বলল।

—'মেস্তিজো সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবে। ওর সাহায্য খুবই প্রয়োজন।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা মাথা দু'পাশে নাড়ল। তার মানে সম্মতি দিল।

—'আর একটা কথা।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

—'আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ফেরৎ দিতে হবে। মারিয়া তো রাজপ্রাসাদে নজরবন্দী থাকবে। কাজেই আমরা তো আর ওকে ফেলে পালাতে পারবো না।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা সম্মতির ভঙ্গী করল। ফ্রান্সিস আবার বলল—'সারাদিনে মারিয়াকে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে। অবশ্য মারিয়ার সঙ্গে আপনার প্রাসাদরক্ষীরাও থাকবে।'

রাজা সম্মতির ভঙ্গী করল। ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন একজন রক্ষী খুলে দিল।

রাজসভা থেকে ফ্রান্সিসরা চলে এল। মেস্তিজোর পিঠের দিকটা তখনও রক্তে ভেজা। বাইরে এসে ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে ওর কাঁধে ভর দিতে বলল। মেস্তিজো তখনও ভালো করে হাঁটতে পারছে না। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো, দলনেতাকে বলো যেন তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।' দলনেতা ওদের সামনে সামনে যাচ্ছিল। মেস্তিজো ওকে কাঁপা কাঁপা গলায় সে কথা বলল। দলনেতা কিছু বলল না।

রাজবাড়ির পেছনদিকে ওরা কিছুদূর এল। একটা পাথরের বাড়ির সামনে দলনেতা দাঁড়াল। দরজা খুলে ফ্রান্সিসদের ইশারায় ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা বাড়িটায় ঢুকল। সামনের ঘরটা বেশ খোলামেলা। একপাশে শুকনো ঘাস বিছোনো। দলনেতা হাততালি দিল। বাড়ির ভেতর থেকে দু'জন লোক এ ঘরে ঢুকল। দলনেতা তাদের কী বলল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'এই দু'জন আমাদের দেখাশুনো করবে।' লোক দু'জন বাড়ির মধ্যে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। হাতে মোটা কাপড়ের কম্বলমতো। সেটা শুকনো ঘাসের গাদার ওপর পেতে দিল। মেস্তিজো বোধহয় জল চাইল। লোক দু'জন চীনেমাটির বড় কুঁজোমতো নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা প্রায় সকলেই জল খেল। ওরা বিছানায় বসল। মেস্তিজো শুয়ে পড়ল।

এবার দলনেতা মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কী বলল। মেস্তিজো বলল—'মারিয়া, দলনেতা আপনাকে রাজবাড়ির অন্দরমহলে রেখে আসবে। এখন আপনাকে যেতে বলছে।' মারিয়া বিছানা থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ওর চোখ জলে ভিজে উঠল। মারিয়া বেশ শক্তমনের মেয়ে। কিন্তু ফ্রান্সিসদের জন্যে ওর মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। তাই দেখে ফ্রান্সিস হেসে বলল—'মারিয়া, আমরা ভাইকিং। আমরা শুধু কব্জির জোরে লড়াই করি না, বুদ্ধির জোরেও লড়াই করি। আমাদের জন্যে মন খারাপ করো না, যাও। দিনে একবার তো দেখা হবেই।'

মারিয়া কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে বোধহয় ফ্রান্সিসদের কথা ভাবতে ভাবতেই আস্তে আস্তে দলনেতার পেছনে পেছনে চলে গেল। ফ্রান্সিসদেরও মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিস্কো বলল—'চলো ফ্রান্সিস, জাহাজে ফিরে যাই।'

'অসম্ভব,' ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল—'বিস্কো তুমি আমাকে ভালো করেই জানো। তোমরা সবাই চলে গেলেও আমি একা এখানে থাকবো। স্বর্ণমূর্তি খুঁজবো, উদ্ধার করবো। তারপর ফিরবো।'

—'না—না ফ্রান্সিস, তোমাকে ছেড়ে আমরা যাবো না।'—বিস্কো দ্রুত বলে উঠল। শাঙ্কোও বলল—'আমরা তোমার সঙ্গেই থাকবো।' ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হলো। ভাবতে লাগল স্বর্ণমূর্তির কথা। কোথায় কীভাবে রাখা হতো সেই মূর্তিটা তা দেখতে হবে। মেস্তিজো শুয়ে আছে। তখনও অল্প অল্প গোঙাচ্ছে।

একটু পরেই একটা রোগা বেঁটেমতো লোক ঘরে ঢুকল। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। মাথায় হলুদ কাপড়ের পাগড়ি মতো। গলায় নানারঙের পাথরের মালা। লোকটার হাতে একটা চীনেমাটির বোয়াম। বোঝা গেল লোকটা বৈদ্য। বৈদ্য মেস্তিজোর কাছে গেল। পিঠের দিকে পঞ্চো সরিয়ে চাবুকের ক্ষত দেখল। তখনও ক্ষত থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। বৈদ্য বোয়াম থেকে সবুজ রঙের আঠা আঠা মতো একটা ওষুধ বের করল। আঙুল দিয়ে ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। মেস্তিজো একটু কঁকিয়ে উঠল। তারপর শান্ত হলো। বোধহয় ব্যথাজ্বালা একটু কমল। একটা ছোট ন্যাকড়ার পুঁটুলি করে চারটে কালো কালো বড়ি বাঁধল। মেস্তিজোকে কী বলল। তারপর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের অস্ত্রশস্ত্র ঘরের কোণায় রেখে গেল।

দু'দিন কেটে গেল। ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল। মেস্তিজো সুস্থ না হলে কিছুই করার নেই। সেই দু'দিনই মারিয়া এসে ওদের দেখে গেল। সেদিন ফ্রান্সিস, মেস্তিজোকো বলল—'এখন তোমার শরীর কেমন?'

—'অনেকটা ভালো।' মেস্তিজো বলল।

—'আমাদের নিয়ে চিকামায় একটু ঘোরাঘুরি করতে পারবে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'পারবো।'

—'তাহলে আজই চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

বিকেল নাগাদ ফ্রান্সিসরা মেস্তিজোকে সঙ্গে নিয়ে চিকামা নগর দেখতে বেরুল। প্রথমে রাজবাড়ির সামনে এল। রাজবাড়ি ওরা আগেই দেখেছে। মেস্তিজোকে ফ্রান্সিস বলল—'রক্ষীদের বলো, মারিয়াকে নিয়ে আসতে। মারিয়াও আমাদের সঙ্গে যাবে।' মেস্তিজো একজন দ্বাররক্ষীকে বলল সে কথা। এ কথাও বলল যে, এটা রাজার হুকুম। রক্ষীটি রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকল। একটু পরেই মারিয়া বেরিয়ে এল। ওদের সঙ্গে চলল। পেছনে দু'জন রক্ষীও চলল।

পথে বেশ ভিড়। কিছুদূর আসার পর ডানদিকে একটা উঁচু বেদীমতো দেখা গেল। বেদীটি থাককাটা। বেদীর ওপরে একটা মূর্তি। ফুলপাতায় মূর্তিটা প্রায় ঢেকে গেছে। বেদীর সামনে এসে ফ্রান্সিস দেখল—মেস্তিজোর গুহাঘরে দেখা সেই কাঠের মূর্তির মতোই এই মূর্তিটা। তবে মেস্তিজোর মূর্তিটা ছিল ছোট। এটা একটু বড়। প্রায় আড়াই তিন ফুট। মেস্তিজো বলল—'এই আমাদের দেবতা হুয়াকার মূর্তি। তবে আসল সোনার মূর্তি নয়, কাঠের।'

—'মেস্তিজো, মূর্তিটা থেকে ফুলপাতা সরিয়ে দাও।' ফ্রান্সিস বলল। 'ভালো করে দেখি।'

মেস্তিজো বেদীর মসৃণ সিঁড়ি বেয়ে উঠল। মূর্তিটা থেকে ফুলপাতা সরাল। সিঁড়িতেও ছড়িয়ে আছে ফুলপাতা। ফ্রান্সিস মূর্তিটা ভালো করে দেখল। সত্যি, এত সুন্দর রঙ ব্যবহার করা হয়েছে যে মনে হচ্ছে সোনার মূর্তি। সিঁড়িতে বেদীতে পাথর কুঁদে কুঁদে সুন্দর ফুল লতাপাতার কাজ করা হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো, এখানকার পাথরের কারুকাজ কি তোমরা করেছো?'

—'না, রাজা কোলা নিজেই এই কারুকাজ করেছেন। রাজা কোলার আর একটা পাথরের

কাজ দেখ।' মেস্তিজো সামনে আঙুল তুলে দেখাল। দেখা গেল একটা বিরাট পাথরের মাথা। একটা ছোটখাটো আস্ত পাহাড় কেটে কুঁদে কুঁদে ঐ মাথাটা তৈরি করা হয়েছে।

মেস্তিজো বলল—'এই মাথাটা পাথর কেটে আমরা তৈরি করেছি—রাজা, কোলা, গুরুদেব লামা আর আমি।

—এটা কীসের মাথা?' মারিয়া বলল।

—'দেবরক্ষীর মাথা।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস একটু লক্ষ্য করে দেখল মূর্তিটার মাথায় গলায় ফুলপাতা ছড়ানো। ফ্রান্সিস বলল—'দেবরক্ষীরও পুজো হয় নাকি?'

—'হ্যাঁ, হুয়াকা দেবতার সঙ্গে দেবরক্ষীরও পুজো হয়।' মেস্তিজো বলল।

—'অত উঁচুতে লোকে ওঠে কি করে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'অনেক উঁচু একটা কাঠের মই আছে। সেটা বেয়ে সবাই ওঠে। ফুলপাতা দিয়ে পুজো করে। আমরাও পাথর কেটে তৈরি করার সময় ঐ মইটা ব্যবহার করতাম।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিসরা স্বর্ণমূর্তির পাথরের বেদীতে ফুল-লতাপাতা, পাখির কাজ, দেবরক্ষীর মাথা, সব দেখতে লাগল। সত্যি, দুটোই দেখতে খুব সুন্দর। রাজা কোলা যে একজন দক্ষ ভাস্কর ছিলেন এসব দেখে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সব দেখেটেখে ফ্রান্সিসরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। মারিয়াকে নিয়ে রক্ষীরা রাজবাড়িতে চলে গেল।

দিন সাতেক কাটল। প্রায় প্রত্যেকদিনই ফ্রান্সিস মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তি দেবরক্ষীর মাথা দেখতে যায়। ঘুরে ফিরে দেখে। কিন্তু আসল স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের কোনো সূত্র পায় না।

শাঙ্কোর কাছে এসব একঘেয়ে লাগে। ও তাই দুপুরের খাওয়া সেরেই তীরধনুক নিয়ে পাখি খরগোশ শেয়াল শিকার করতে বেরিয়ে যায়। ডানদিকের সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ওপারেই বনজঙ্গল শুরু হয়েছে। খুব গভীর বন নয়। তবে গাছপালা প্রচুর। ঐ বনজঙ্গলেই শাঙ্কো শিকার করতে যায়।

এর মধ্যে রাজা লুপাকা ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠিয়েছিল। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারবে কি না, পারলে কবে নাগাদ পারবে এসব জিজ্ঞেস করেছিল। মেস্তিজোর মারফৎ ফ্রান্সিস বলেছে—'খোঁজখবর করছি। কোনো সূত্র এখনও পাইনি। তবে বেশিদিন লাগবে না।'

সেদিনও শাঙ্কো তীরধনুক নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল দুপুরে খেয়েদেয়ে। বিকেল হয়ে



দেবরক্ষীর মাথা।

গেল তখনও ফিরল না। ফ্রান্সিস আর বিস্কো ভাবল শাঙ্কো বোধহয় বেশি শিকার পেয়েছে তাই আসতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু সন্ধ্যে হলো, রাত হলো শাঙ্কো ফিরল না। এবার ফ্রান্সিস আর বিস্কো চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে বলল—'শাঙ্কো এখনও শিকার থেকে ফিরল না, কী ব্যাপার বলো তো?'

—'ঐ তিতিকাকা জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী নেই। তবে বিষধর সাপ আছে। শাঙ্কোকে কি সাপেই কামড়াল নাকি, ঠিক বুঝতে পারছি না।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হয়ে ছিল। ভাবল, এভাবে অপেক্ষা করে দুশ্চিন্তাই বাড়বে শুধু। ঐ বনে-জঙ্গলে গিয়েই শাঙ্কোর খোঁজ করা ভাল। ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ডাকল—'বিস্কো অস্ত্র নাও। শাঙ্কোর খোঁজে যাবো।' বিস্কো দেয়ালের খাঁজে রাখা তরোয়ালটা নিল। ফ্রান্সিস বিছানার তলা থেকে নিজের তরোয়াল বার করল। বলল—'মেস্তিজো, তুমি আমাদের পথ দেখাবে চলো।'

তিনজন ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের দিকে চলল। মেস্তিজো সবার সামনে চলল। হাতে জ্বলন্ত মশাল। পাহাড় পেরিয়ে ওপাশে নামল। জঙ্গলে ঢুকল। খুব নিবিড় বন নয়। গাছপালা লতাগাছ এসব বেশ ছাড়া ছাড়া। ওরা মশালের আলোয় গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলল। বনে পথ বলে কিছু নেই। বেশ কিছুটা এল। কিন্তু ফ্রান্সিস ভেবে পেল না এই রাতেরবেলা বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় শাঙ্কোকে খুঁজবে। তবু দু'হাতের তালু মুখের সামনে গোল করে চীৎকার করে ডাকল—'শাঙ্কো—শাঙ্কো—।' কিন্তু নির্জন বনভূমিতে কোনো উত্তর ভেসে এল না। শুধু একটা পাখির দল কিচ্‌মিচ্‌ করে উঠল। রাতজাগা পাখিরা ডানা ঝাপটাল। বিস্কোও একইভাবে চীৎকার করে বলল—'শাঙ্কো, আমরা এসেছি। তোমার কোনো ভয় নেই। শাঙ্কো-ও-।' কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ওরা এগোতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের কানে এল শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ। ও থমকে দাঁড়াল। তরোয়ালের হাতলে হাত রেখে ডাকল—'বিস্কো, সাবধান।' ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই ওদের চারদিকে শুকনো পাতা ভেঙে কারা ছুটে এল। ওদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল একদল যোদ্ধা। তাদের হাতে উদ্যত বর্শা। মেস্তিজো যোদ্ধাদের মশালের আলোতে দেখেই চীৎকার করে কী বলে উঠল উনকা ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা বর্শা নামাল। সবাই মাথা নিচু করে মেস্তিজোকে সম্মান জানাল। মেস্তিজো বলল—'ফ্রান্সিস, আপনারা যুদ্ধ করবেন না। এরা আমাদের বন্ধু। এরা উনকা সৈন্য। রাজা কোলার সৈন্যবাহিনীর সৈন্য। যুদ্ধে পরাজয়ের পর এরা এই তিতিকাকা জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে।'

ফ্রান্সিস আর বিস্কো তরোয়াল খুলল না আর। যোদ্ধাদের মাথায় কালো কাপড়ের ফেট্টি। তাতে পাখির পালক গোঁজা। মুখের দুপাশে লাল রঙ লাগানো। ওদের দলনেতা এগিয়ে এল মেস্তিজোর সামনে। মেস্তিজোর সঙ্গে দলনেতা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। তারপর মেস্তিজো ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—'শাঙ্কোকে এরা রাজা লুপাকার গুপ্তচর ভেবে বন্দী করে রেখেছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। শাঙ্কো ভালো আছে।'

—'শাঙ্কোকে ওরা যেখানে রেখেছে সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে বলো।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো দলনেতাকে বলল সে কথা। দলনেতা মাথা ঝাঁকাল। কী বলল। তারপর গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলল। মেস্তিজো বলল—'চলুন ওদের সঙ্গে।' সবার সামনে দলনেতা মেস্তিজোর মশালটা নিয়ে চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। ওদের পেছনে যোদ্ধারা। একটু পরে মশালের আলোয় দেখা গেল বনভূমির গাছপালা পাতলা হয়ে এসেছে। সামনে গাছপালার আড়ালে একটা লম্বাটে বাড়ি দেখা গেল। পেইকো ঘাসের ছাউনি। কাঠ পাথর

মিলিয়ে বাড়িটা নতুন তৈরি হয়েছে।

সবাই বাড়িটার সামনে এল। বর্শা হাতে চারজন উনকা যোদ্ধা এগিয়ে এল। মেন্তিজোকে দেখে তারাও মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল। ফ্রান্সিস বুঝল উনকারা রাজপুরোহিতের শিষ্য বলে মেন্তিজোকে শ্রদ্ধা করে, ভালোও বাসে। দলনেতা রক্ষী যোদ্ধাদের কী বলল। ওরা চলে গেল। দলনেতার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা এসে বাড়িটার সামনের উঠোনে দাঁড়াল। দলনেতা একটা লম্বা ঘর দেখিয়ে মেন্তিজোকে কী বলল। মেন্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'আপনাদের এই ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।' ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। লম্বাটে ঘর। কাঠ আর পাথরের দেয়াল। ঘরের দু'পাশের দেয়ালে দুটো বাতি জ্বলছে। তার আলোয় দেখা গেল সারা ঘর জুড়ে শুকনো ঘাসের বিছানা। তাতে মোটা কম্বলমতো পাতা। প্রায় আট-দশজন উনকা যোদ্ধা তাতে শুয়ে বসে আছে। ফ্রান্সিসরা এতটা হেঁটে তখন বেশ ক্লান্ত। ওরাও বিছানায় বসল। ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা অনেকগুলো বর্শা।

একটু পরেই শাঙ্কো হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। ওর কাঁধে তীর ধনুক। ও ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। শাঙ্কোকে সুস্থদেহে দেখে বন্ধুরা খুশি হলো।

—'এখানে তোমার ওপর কোনো অত্যাচার করা হয়নি তো?' ফ্রান্সিস বলল।

—'না-না। এরা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। কারণ ধরা পড়ার পর আমি বারবার মেন্তিজোর নামটা বলেছি। তাতেই দেখলাম ওরা আমাকে বিশ্বাস করল।' শাঙ্কো তীর ধনুক রেখে বিছানায় এসে বসল। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে লাগল।

বিস্কো বলল—'ফ্রান্সিস, স্বর্ণমূর্তি-বেদী,—দেবরক্ষীর মাথা সব তো দেখলে। আসল স্বর্ণমূর্তির কোনো হদিস করতে পারলে?'

—'এখনই কিছু বলতে পারছি না। সব বার বার ভালোভাবে দেখতে হবে। সূত্র একটা পাবোই। ফ্রান্সিস বলল। ওরা কথাবার্তা বলছে। তখনই মেন্তিজো ঢুকল। ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। বলল—'ফ্রান্সিস—এরা তোমাদের আজকে রাতে এখানে অতিথি হিসেবে থাকতে অনুরোধ করেছে।' ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল। বিস্কো বলল—'রাতে তো আমাদের কোনো কাজ নেই। থাকি না এখানে। একটা রাতই তো।' ফ্রান্সিস মেন্তিজোর দিকে তাকিয়ে বলল—'বেশ। বন্ধুরা যখন বলছে।'

—'উনকা যোদ্ধারা খুব খুশি হবে। যাই ওদের কথাটা বলে আসি।' মেন্তিজো চলে গেল।

রাত বাড়ল। একসময় একজন উনকা যোদ্ধা এসে ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের রাতের খাওয়া খেতে ডাকল। ফ্রান্সিসরা ঘরের বাইরে এল। লম্বাটে ঘরের সামনে উঠোনে দেখল তিনকোণা পাতা পেতে দেওয়া হয়েছে। যোদ্ধারা খেতে বসছে পাতার সামনে। ওরাও খেতে বসল। ফ্রান্সিস দেখল উনকা সৈন্যরা সংখ্যায় একশ'রও বেশি। খেতে দেওয়া হলো সেই বীন আলুর তরকারি। ক্যারোপ বীনের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রুটি, সামুদ্রিক মাছের ঘন ঝোলমতো। ওরা খেতে লাগল। খিদেও পেয়েছিল বেশ।

সবারই খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। ফ্রান্সিসরা আগের ঘরে এসে বিছানায় বসল। অন্য যোদ্ধারাও এসে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। ফ্রান্সিসরা সেই উনকা ভাষার বিন্দুবিসর্গও বুঝল না। তবে মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তার মধ্যে রাজা লুপাকার নাম ওরা শুনছিল।

কিছুক্ষণ পরে মেন্তিজো এল। পেছনে সেই দলনেতা। ওরা দু'জনে ফ্রান্সিসের কাছে এসে বসল। মেন্তিজো দলনেতাকে দেখিয়ে ফ্রান্সিসকে বলল—'ওরা বলছিল তোমরা ওদের কোনোভাবে সাহায্য করতে পারো কিনা।' ফ্রান্সিস ঠিক বুঝল না, মেন্তিজো কী বলতে চাইছে। ফ্রান্সিস বলল—'একটু বুঝিয়ে বলো।'

—'ফ্রান্সিস—' মেন্তিজো বলল— 'তোমরা ভাইকিং। তোমাদের শৌর্যবীর্যের কথা খুব ছেলেবেলায় আমি শুনেছি। তাই আমিও চাই তোমরা এদের সাহায্য কর। তোমাদের সাহায্য পেলে ওদের সাফল্য সুনিশ্চিত।'

—'কীভাবে সাহায্য করবো সেটা বলো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'এই উনকা যোদ্ধারা এই তিতিকাকা বনে আশ্রয় নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সব উনকা যুবকদের একত্রিত করছে। শক্তি সংগ্রহ করে ওরা কিছুদিন পরেই রাজা লুপাকার সৈন্যবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যে করেই হোক, ওরা উনকাদের রাজ্য থেকে সৈন্যসহ রাজা লুপাকাকে তাড়াবে। এটাই ওদের প্রতিজ্ঞা। দেশ ও জাতিকে যে করেই হোক শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবে। সেইজন্যে ওরা তোমাদের সাহায্য চায়।' মেন্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল ব্যাপারটা। হ্যারি থাকলে ভালো হতো। ওর পরামর্শ নেওয়া যেত। ফ্রান্সিসকে একাই ভাবতে হলো সব। ভেবে নিয়ে ও বলল—'তার মানে ওরা চাইছে আমরা যেন ওদের দলে যোগ দিই—রাজা লুপাকার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে নামি।'

—'হ্যাঁ, তোমাদের সাহায্যে উনকাদের রাজ্য উদ্ধার করতে পারলে ওরা তোমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।' মেন্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস বলল—'কিন্তু মেন্তিজো—রাজা লুপাকা তো এখনও আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। অবশ্য গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের পর রাজা লুপাকা অন্য চেহারা নিতে পারে। এমনকি আমাদের হত্যাও করতে পারে। আমি সেটা ভালো করেই জানি। রাজা লুপাকা অসৎ ও লোভী। তবু এখনও তো ও আমাদের বিপদে ফেলেনি। কাজেই আমরা কেন রাজা লুপাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে যাবো। এসব তোমাদের ব্যাপার। তোমরাই মিটিয়ে নাও।'

—'তাহলে তোমরা এদের সাহায্য করবে না?' মেন্তিজো বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলল।

—'না, এই অবস্থায় পারবো না। তাছাড়া ভেবে দেখ—মারিয়া এখন রাজা লুপাকার হাতের মুঠোয়। মারিয়া বন্দিনী। আমরা যুদ্ধে উনকাদের সাহায্য করছি, এ সংবাদ রাজা লুপাকা পাবেই। তখন মারিয়ার জীবন বিপন্ন হতে পারে। সবদিক ভেবে বলছি এখন, আমাদের এসব ব্যাপারে না জড়ানোই ভালো।' ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

মেন্তিজো আর কিছু বলল না। দলনেতাকে উনকা ভাষায় কী বলে গেল। বোধহয় ফ্রান্সিসের কথাগুলোও বলল। দলনেতা দু-একবার মাথা নেড়ে উঠে চলে গেল। মেন্তিজো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—'আজ হোক, কাল হোক—লড়াই হবেই।'

রাত বাড়ল। ফ্রান্সিসরা ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও তখন ভাবছে—গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করা যাবে কি? কোনো সূত্রই তো পাচ্ছি না। এখানে বেশিদিন থাকাও চলবে না। দেরি দেখে হয়তো বন্ধুরা এসে হাজির হবে। আবার স্বর্ণমূর্তির সন্ধান করতে ওরা ব্যর্থ হলে লোভী রাজা লুপাকা কী চেহারা ধরে কে জানে? হয়তো ওদেরও মারিয়ার মতো বন্দী করে রাখতে পারে। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালেই ওরা চিকামায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। আসার সময় দলনেতা ফ্রান্সিসকে বেশ সুন্দর ফুল-লতাপাতার কাজ করা একটা পঞ্চো উপহার দিল। ফ্রান্সিস খুব খুশি হলো। বারবার বলল—'ধন্যবাদ।' মেন্তিজো কথাটা বুঝিয়ে দিল দলনেতাকে।

বিকেলে মারিয়া এল। সঙ্গে সেই দু'জন চিমু

পাহারাদার সৈন্য। মেস্তিজো সারা দুপুর টানা ঘুমিয়ে তখনই উঠল। আড়মুড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলল—'যাবে না কি হুয়াকার উৎসবে?'

—'কোথায় হবে? বিস্কো জানতে চাইল।

—'ঐ হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তির বেদীর সামনে। নাচগান হবে। রাজা লুপাকা রানী দু'জনেই নাকি আসবে। রাজা লুপাকা এখন চেষ্টা করছে উনকাদের মন জয় করতে। যাবে তোমরা?

মারিয়া খুশির চোটে হাততালি দিল। বলল—'ফ্রান্সিস, চলো না।'

—'যাবো তো কিন্তু রাজা লুপাকা কী তোমাকে ওখানে যাবার অনুমতি দেবে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'কেন দেবে না? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।' মারিয়া বলল।

—'ঠিক আছে। মেস্তিজো, কখন আরম্ভ হবে উৎসব?' ফ্রান্সিস বলল।

—'একটু রাতে। আমরা খেয়ে-দেয়ে যাবো। উৎসব বেশ কিছুক্ষণ চলবে।' মেস্তিজো বলল।

—'তাহলে এক কাজ কর মেস্তিজো। তুমি মারিয়াকে নিয়ে রাজা লুপাকার কাছে যাও। রাজাকে বল যেন মারিয়াকে উৎসব দেখতে যেতে অনুমতি দেয়। অবশ্য সঙ্গে পাহারাদার থাকবে।' ফ্রান্সিস বলল।

—'দেখি বলে। 'মেস্তিজো ঘাসের বিছানা ছেড়ে উঠল। মারিয়াকে নিয়ে রাজবাড়িতে গেল।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই মেস্তিজো ফিরে এল মারিয়াকে নিয়ে। সঙ্গে সেই দু'জন চিমু পাহারাদার। হেসে বলল—'রাজা লুপাকার মেজাজ এখন খুব ভালো। চিকামার গণ্যমান্য উনকারা নাকি দল বেঁধে রাজারানীকে উৎসবে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করে গেছে। কাজেই মারিয়ার অনুমতি বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেছে।'

রাতের খাওয়া-দাওয়া সারল ফ্রান্সিসরা। মারিয়ার পাহারাদার সৈন্য দু'জনও ওদের সঙ্গে খেল।

একটু রাত হতেই সবাই চলল উৎসব প্রাঙ্গণের দিকে। ফ্রান্সিস উপহার পাওয়া পঞ্চো পরল। মারিয়া তাই দেখে হাসতে লাগল।

হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তির বেদীর সামনের প্রাঙ্গণে উৎসবের আয়োজন হয়েছে। দেবতার পুজো দুপুরবেলাই হয়ে গেছে। স্বর্ণমূর্তি অর্থাৎ কাঠের মূর্তি ফুলে পাতায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। বেদীতেও ফুললতাপাতার স্তূপ। প্রাঙ্গণের চারিদিকে মশাল জ্বলছে। উৎসব প্রাঙ্গণ আলোয় আলোময়। প্রাঙ্গণের চারপাশে বহু নারী-পুরুষ-শিশুরা জড়ো হয়েছে। গাছের গুঁড়ি কুরে তার মুখে ভেড়ার চামড়া আটকে বাজনা তেরি করা হয়েছে। সেটাই একজন দমাদম বাজাচ্ছে। কচ্ছপের নাড়ি দিয়ে তৈরি বাজনা আর একজন বাজাচ্ছে। টানা টানা সুরের বাজনা।

একটু পরেই দু'টো পাহাড়ী ঘোড়ায় চেপে রাজা লুপাকা আর রানী এল। সামনে পেছনে রাজার দেহরক্ষীরা। দু'জনেই বেশ সেজেগুজে এসেছে। রাজার মাথায় বেশ মোটা করে হলুদ ফেট্টি বাঁধা। তাতে একটা ধবধবে সাদা পাখির লম্বা পালক। রানীর ঢিলেঢালা পোশাকে কাঁচের টুকরো বসানো। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে সেসব। উপস্থিত উনকারা কেউ কিন্তু রাজারানীর জয়ধ্বনি করল না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। শুধু উপস্থিত চিমু সৈন্যরা হাতের বর্শা আকাশের দিকে তুলে তুলে কী বলল সমস্বরে চীৎকার করে। বোধহয় রাজা লুপাকা ও রানীর জয় ঘোষণা করল।

দেবরক্ষীর মূর্তি সেই মাথাটার নিচেই পাথরের আসন। রাজারানী ঘোড়া থেকে নেমে সেই আসনে বসল। শুরু হলো বাজনা। খুব সেজেগুজে একদল উনকা মেয়ে প্রাঙ্গণে ঢুকল। তাদের গায়ে উজ্জ্বল সুতোর নক্সা আঁকা ঢিলেঢালা পঞ্চো। মাথার বিনুনিতে নানা রঙের ফুল গোঁজা। মাথায় কপালে লাল মোটা ফেট্টি বাঁধা। তাতে নানা রঙের পাখির পালক। বাজনার তালে তালে শুরু হলো মেয়েদের নাচ। নাচের সঙ্গে বেশ চড়া সুরে মেয়েরা গানও গাইতে লাগল। ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। দর্শকরা চীৎকার করে তাদের উৎসাহিত করতে লাগল।

নাচগান থামল। রানী হাত তুলে আবার নাচিয়েদের নাচগান করতে নির্দেশ দিল। আবার বাজনা বেজে উঠল। শুরু হলো নাচ আর সেইসঙ্গে গান। সেই গান উনকা ভাষার গান। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'এটা হচ্ছে হুয়াকা দেবতাকে বন্দনার গান।' নাচগান চলল কিছুক্ষণ। দর্শকরা নাচিয়েদের দিকে ফুল ছুঁড়ে দিতে লাগল। চীৎকার করে উনকা ভাষায় কী বলতে লাগল। বোধহয় নাচিয়েদের বাহবা দিতে লাগল।

নাচগান শেষ হলো। বাজনা বন্ধ হলো। গোলমাল থামতে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি তরুণ নাচিয়ে মেয়েদের সামনে এসে দাঁড়াল। দর্শকরা অবাক। তরুণটির মুখ মশালের আলোয় উজ্জ্বল। উত্তেজনায় তরুণটির ঠোঁটদুটো কাঁপছে। তরুণটি মুখের কাছে হাতের চেটো গোল করে চিৎকার করে কী বলে উঠল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'সর্বনাশ। ছেলেটি রাজা কোলার জয়ধ্বনি দিচ্ছে। ও বিপদে পড়বে।' তারপরই তরুণটি তীক্ষ্নস্বরে একটা গান ধরল। মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য জাগল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'ছেলেটি রাজা কোলার গুণকীর্তন করে গান গাইছে। উনকারা সবাই এই গান জানে।' সত্যিই দেখা গেল সব দর্শকরা—বেশির ভাগই উনকা উঠে দাঁড়িয়েছে। তরুণটির গানের সঙ্গে ততক্ষণে গলা মিলিয়েছে নাচিয়ে উনকা মেয়েরাও। আস্তে আস্তে উপস্থিত প্রায় সব দর্শকরা সেই গানের সঙ্গে গলা মিলাল।

ওদিকে রাজা লুপাকা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রানীও। রাগে রাজা লুপাকার মুখ লাল হয়ে গেছে। তার চিরশত্রু রাজা কোলার গুণগান গাইছে তারই সামনে। অসহ্য। রাজা চীৎকার করে কী বলে উঠল। চিমু সৈন্যরা বর্শা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল উনকাদের ওপর। উনকাদের মুখে গান বন্ধ হয়ে গেল। গান থামিয়ে নাচিয়ে মেয়েরাও প্রাঙ্গণ থেকে পালাল। দর্শকদের চীৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হলো। শুধু সেই তরুণটি একা তখনও গান গেয়ে চলেছে। রাজা লুপাকা তার দেহরক্ষীর একজনকে ইঙ্গিত করল। রক্ষীটি ছুটে এসে তরুণটির বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিল। তরুণটি উবু হয়ে উৎসব প্রাঙ্গণে পড়ে গেল। ওর গান বন্ধ হয়ে গেল। কয়েকবার নড়ে ওর দেহটা স্থির হয়ে গেল।

শাঙ্কো অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল—'ইস্, সঙ্গে যদি তীর ধনুকটা থাকতো ঐ দেহরক্ষীটাকে আমি এক্ষুনি নিকেশ করতাম।' ওদিকে লোকজন সব ছুটোছুটি করে এদিক ওদিক পালাতে শুরু করেছে। চিমু সৈন্যদের বর্শার ঘায়ে কিছু লোক জখমও হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই প্রাঙ্গণ জনশূন্য হয়ে গেল। আহত লোকদের আর্ত চীৎকার শোনা যেতে লাগল।

ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে বলল—'শীগগির তোমাদের কোনো বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে এসো। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।' ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কো আহত লোকজনদের ধরাধরি করে প্রাঙ্গণের একধারে এনে শুইয়ে দিল। মারিয়া নিজের ঢোলা পোশাক থেকে কাপড় ছিঁড়ে আহতদের ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে লাগল। তাতে কারো কারো ক্ষতস্থান থেকে রক্তপড়া বন্ধ হলো। একটু পরেই মেস্তিজো একজন বৈদ্যকে নিয়ে এল। সে তার ঝোলা থেকে ওষুধ বের করে আহতদের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতে

লাগল। ফ্রান্সিস ডেকে বলল—'মারিয়া, এবার চলো। আমাদের আর কিছু করার নেই।'

ফ্রান্সিসরা ফিরে এল। মেস্তিজো আহতদের দেখাশুনো করার জন্যে থেকে গেল। বিশেষ করে মৃত তরুণটির সৎকারের জন্যেই মেস্তিজোকে ফ্রান্সিস থাকতে বলল। ফেরার পথে ফ্রান্সিসের বারবার সেই উদ্দীপ্তমুখ গাইয়ে তরুণটির কথা মনে পড়তে লাগল। ওর মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল।

তারপর কয়েকদিন কাটল। ওদিকে জাহাজে ফেরার তাগিদ রয়েছে। ফ্রান্সিসদের ফিরতে দেরি হলে হয়তো বন্ধুরা এসে হাজির হবে।

সেদিন বিকেলের দিকে মারিয়া ফ্রান্সিসদের আস্তানায় এল। সঙ্গে দু'জন রক্ষীও এল। মারিয়া বলল—'ফ্রান্সিস, চলো বেড়িয়ে আসি।' বিস্কো আর শাঙ্কো বলল—'চলো আমরাও যাবো।' মেস্তিজোও ওদের সঙ্গী হলো। চিকামার রাস্তা দিয়ে চলল ওরা। চিমু সৈন্যরা, চিকামার অধিবাসীরা ওদের চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এই ভিনদেশী মানুষগুলো বিশেষ করে ঐ মেয়েটি অর্থাৎ মারিয়া যে কেন এখানে এসেছে, কেন এখনো আছে তাই ওরা ভেবে পেল না।

হুয়াকা দেবতার সেই কাঠের নকল মূর্তির বেদীর কাছে যখন ওরা পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। ওরা দেখল নকল মূর্তিটি তেমনি ফুলপাতায় প্রায় চাপা পড়ে গেছে। চিকামার উনকা লোকেরা আসছে ফুলপাতা হাতে। পুজো দিচ্ছে। ফুলপাতা দিচ্ছে মূর্তিতে। বেদীও ঢেকে গেছে ফুলপাতায়। কিছু লোক আবার বিরাট উঁচু কাঠের মই বেয়ে বেয়ে উঠে দেবরক্ষীর মাথায় গলায় ফুলপাতা ছুঁড়ে দিচ্ছে। অত উঁচু মইটা বোধহয় পুজো দেবার সুবিধের জন্যেই এখন লাগানো হয়েছে। ফ্রান্সিস ভাবল—হুয়াকার মূর্তিটা তো কাছ থেকে দেখেছি কিন্তু দেবরক্ষীর মূর্তিটা ভালো করে দেখা হয়নি। কারণ তখন মইটা ছিল না। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া, তোমরা অপেক্ষা কর। দেবরক্ষীর মাথাটা কাছ থেকে দেখে আসছি।'

ফ্রান্সিস কাঠের সেই অনেক উঁচু মইটার কাছে গেল। তারপর ওপর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মইটা বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে মূর্তির মুখের কাছে এল। মোটা ঠোঁট দাঁত পেরলো। নাক ছাড়ালো। চোখ দুটো পুরো গোল নয়। কেমন চৌকো মতো। চোখ দুটো পার হলো। কপাল পার হলো। উঠে এল মাথার উষ্ণীষের কাছে। এতক্ষণ গলা মুখ নাক চোখ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এসেছে। কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কিছুই দেখতে পেল না। দেবরক্ষীর উষ্ণীষের ওপর নামল ফ্রান্সিস। চারদিকে তাকিয়ে দেখল বিকেলের নরম আলোয় অনেকদূর দেখা যাচ্ছে। চিকামার রাজবাড়ি বাড়িঘর রাস্তা তিতিকাকা বন দূরে সমুদ্রের দিকে পাহাড়ের সারি সব দেখা গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে হুয়াকার মূর্তি বেদী পূজার্থী ও মারিয়াদের দেখল। ফ্রান্সিস মনে মনে রাজা কোলার প্রশংশা করল। একটা ছোট পাহাড় কেটে এইরকম মূর্তির মাথা তৈরি করা শুধু পরিশ্রমের কাজই নয় সেইসঙ্গে শিল্পবোধও থাকা চাই।

এবার ফ্রান্সিস নামবার জন্যে মইয়ে পা রাখল। তারপর আস্তে আস্তে নামতে লাগল। উষ্ণীষ পার হলো। যখন মূর্তিটার কপালের কাছে এল তখনই মূর্তিটার কপালের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস থমকে দাঁড়াল। কপালে কী যেন কুঁদে আঁকা। ও প্রথমে ভাবল হয়তো কপালের কোনো অলঙ্কার। ভালো করে দেখল। সন্দেহ হলো অলঙ্কার নয়—কী যেন পাথর কুঁদে লেখা। বিদ্যুৎচমকের মতো হঠাৎ ওর মনে পড়ল রাজপুরোহিত ল্লামার শেষ কথাটা— রাজা কোলা যে কথাটা বলেছিলেন—'সবই ললাটের লিখন।' তাহলে তো এই মূর্তিটার কপালে নিশ্চয়ই কিছু লেখা আছে। এই লেখাটা তো তাহলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কী লেখা আছে কপালে?

ফ্রান্সিস দ্রুত নেমে এল মই বেয়ে। ফ্রান্সিসকে এভাবে দ্রুত নেমে আসতে দেখে মারিয়ারা সবাই বেশ আশ্চর্য হলো। কী হলো ফ্রান্সিসের? নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে।

ফ্রান্সিস মই থেকে নেমে মেস্তিজোর কাছে ছুটে এল। বলল—'মেস্তিজো, রাজা কোলা বলেছিলেন সবই ললাটের লিখন। তাই কিনা?'

—'হ্যাঁ।' মেস্তিজো বলল। কিন্তু ফ্রান্সিস এই কথাটা বলছে কেন ও ঠিক বুঝল না। কথাটার এত গুরুত্বই বা দিচ্ছে কেন।

—'তোমার গুরুদেব রাজপুরোহিতও এই কথাটাই বলেছিল সবই ললাটের লিখন। তাই কিনা?'

—'হ্যাঁ।'

—'চলো মই বেয়ে উঠতে হবে। এসো তাড়াতাড়ি।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো ফ্রান্সিসের এই পাগলামির কারণ বুঝল না। তবু ফ্রান্সিসের কথামতো মইয়ের কাছে এল। দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস উঠতে উঠতে বলল—'মেস্তিজো, তুমি, তোমার গুরুদেব রাজপুরোহিত আর রাজা কোলা মিলে এই মূর্তিটা বানিয়েছিলে। পাথর কুঁদে।'

—'হ্যাঁ।' মেস্তিজো বলল—'তবে বলতে পারো রাজা কোলার কৃতিত্বই বেশি। সমস্ত পরিকল্পনাটাই রাজা কোলার। উনিই পাথর কেটেছেন কুঁদেছেন আমরা শুধু পাথর মসৃণ করেছি।'

দেবরক্ষীর কপালের কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—'ললাটের লিখন মানে কপালের লেখা।' এবার মূর্তির কপালের সেই লেখাগুলো দেখাল। 'বলো তো ওগুলো কী লেখা? মেস্তিজো লেখাগুলো দেখল। লেখাগুলো দেখতে এমনি—



(০ ৪ ৮ ১২ ১৬)

মেস্তিজো মনোযোগ দিয়ে লেখাগুলো দেখে বলল—'এগুলো কোনো লেখা নয়। পর পর কয়েকটা উনকা ভাষায় অঙ্কের সংখ্যা কুঁদে লেখা। আমার মনে হয় রাজা কোলা এগুলো পরে কুঁদে লিখেছিলেন।'

—'বলো তো সংখ্যাগুলো কী?' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো পড়ে পড়ে বলল—০ ৪ ৮ ১২ ১৬।' ফ্রান্সিস আশা করেছিল লুকানো স্বর্ণমূর্তির সম্বন্ধে কোনো সাঙ্কেতিক লেখা। এখন বুঝল এগুলো অঙ্ক। একটু হতাশই হলো। তবু অঙ্কগুলো মনে মনে মুখস্থ করল। বলল—'কিছু লেখা নেই?'

—'না। কিন্তু এই অঙ্কগুলো দিয়ে তোমার কী হবে?' মেস্তিজো বলল।

—'হবে হবে। তবে অনেক ভাবতে হবে এই অঙ্কগুলো নিয়ে। তবেই রহস্য ভেদ করা যাবে। রাজা কোলা যখন নিজে এই অঙ্কগুলো কুঁদে লিখেছিলেন তখন নিশ্চয়ই এই অঙ্কগুলোর গুরুত্ব আছে। তাছাড়া 'ললাটের লিখন' কথাটা ভুলে যেও না।' ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস নামতে লাগল। ও তখনও অঙ্কের সংখ্যাগুলো নিয়ে ভেবে চলেছে। সঙ্গে মেস্তিজোও নামতে লাগল। মূর্তিটার মুখের কাছে এসে মুখটা দেখতে লাগল। মোটা ঠোঁট মূর্তিটার। প্রায় চৌকোনা। দাঁতগুলো পর পর সাজানো। ফ্রান্সিস কিছুটা অন্যমনস্ক ভঙ্গীতেই দাঁতগুলো দেখতে লাগল। হঠাৎ ওর মনে হলো—অঙ্কের ব্যাপার যখন, তখন দাঁতগুলো সংখ্যায় কটা দেখতে হয়। ও গুনলো। মোট ১৬টা দাঁত। এবার মূর্তিটার কপালের দিকে তাকাল। ঐ তো ওখানে শেষ সংখ্যা—১৬। আশ্চর্য! তাহলে তো সংখ্যাগুলোর সঙ্গে

ষোলটা দাঁতের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কী সেই সম্পর্ক?

মই বেয়ে দু'জনে নেমে এল। মারিয়া বিস্কো শাঙ্কো এগিয়ে এল। মারিয়া বলল—'কী ব্যাপার ফ্রান্সিস? তোমাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে।' একটু হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—'হ্যাঁ মারিয়া, স্বর্ণমূর্তির রহস্যের সমাধান প্রায় হাতের মুঠোয়। তবে ভাবনাচিন্তা করতে হবে।'

বিস্কো শাঙ্কো জানে ফ্রান্সিস এসব ব্যাপারে কখনও বাজে কথা বলে না। ও নিশ্চয়ই মূর্তি উদ্ধারের কোনো হদিস পেয়েছে।

ওদের মধ্যে আর কোনো কথা হলো না। মারিয়া এই ব্যাপারে ফ্রান্সিসকে কোনো প্রশ্ন করল না। সময় হলে ফ্রান্সিস সব বলবে। ফ্রান্সিসরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। মারিয়াকে নিয়ে রক্ষী দু'জন রাজবাড়ি চলে গেল।

ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ ঘাসের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। মেন্তিজোর মনে তখনও সংশয়। ফ্রান্সিস কি পারবে? দেবরক্ষী মূর্তির কপালে কয়েকটা অঙ্কের সংখ্যা লেখা আছে। তা থেকে কি স্বর্ণমূর্তি কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা বের করা যাবে?

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল—'মেন্তিজো, তুমি দু'টো কাজ কর। লেখবার জন্যে একটা সাদা চামড়া আর কালি কলম নিয়ে এসো। আর তোমার হাতুড়ি ছেনি কোথায় আছে?'

—'এখানেই—আমার পুরোনো আস্তানায়।' মেন্তিজো বলল।

—'ওদু'টোও নিয়ে এসো।' ফ্রান্সিস বলল।

মেন্তিজো চলে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে এল। হাতে সাদা চামড়া আর পালকের কলম্‌ দোয়াতদান। হাতুড়ি ছেনিও সঙ্গে এনেছে।

ফ্রান্সিস নিল সে সব। মেন্তিজো বিস্কো শাঙ্কো সাগ্রহে এগিয়ে এল। দেখা যাক ফ্রান্সিস কী করে এসব নিয়ে। ফ্রান্সিস ভেড়ার চামড়ায় কালি কলমে লিখল—

০ ৪ ৮ ১২ ১৬

সংখ্যাগুলো লিখে ও ভাবতে লাগল এই সংখ্যাগুলো নিশ্চয়ই কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করছে। সে সংখ্যাটা কত? ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল। মেন্তিজো বিস্কো শাঙ্কো বোকার মতো সেই সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। এই সংখ্যাগুলো দিয়ে কী হবে তা ওরা বুঝতেই পারল না। সংখ্যাগুলো মুখে আওড়াতে আওড়াতে ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল সব সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান রয়েছে চার অঙ্কের। তাহলে ৪ই সেই নির্দিষ্ট সংখ্যা যার প্রতি এই সংখ্যাগুলো ইঙ্গিত করছে।

ফ্রান্সিস খুশির হাসি হাসল। উৎসাহে উঠে দাঁড়াল। মেন্তিজো ভেবে পেল না ফ্রান্সিসের এত উৎসাহের কারণ কী? ফ্রান্সিস বলল— 'মেন্তিজো চলো দেবরক্ষীর মূর্তিতে উঠবো।'

—'কেন?' মেন্তিজো বলল।

—'তুমি হাতুড়ি ছেনি দিয়ে দেবরক্ষীর মূর্তির চার নম্বর দাঁতটা তুলবে।' ফ্রান্সিস বলল।

মেন্তিজো অবাক। বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো?'

— সেটা পরে বুঝবে? চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

সবাই দেবরক্ষীর মূর্তির সামনে এল। তখন রাত হয়েছে। বেদী প্রাঙ্গণ জনশূন্য। বেদীর সামনে প্রাঙ্গণের ধারে মশাল জ্বলছে। চারপাশ মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস মইটার সামনে এল। মেন্তিজোকে ইঙ্গিতে মই বেয়ে উঠতে বলল। দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। মেন্তিজোর হাতে হাতুড়ি ছেনি। বিস্কো শাঙ্কো নিচে দাঁড়িয়ে রইল।

মই বেয়ে উঠতে উঠতে দু'জনে মূর্তিটার মুখের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—'মূর্তির পাথরটা কি খুব শক্ত?'

—'না-না। এটা বোসেটা পাথর কেটে তৈরি। বোসেটা পাথর সাধারণ পাথরের চেয়ে নরম।'

—'তাহলে চার সংখ্যার দাঁতটা ছেনি দিয়ে কেটে তোলো।' ফ্রান্সিস বলল।

মেন্তিজো হাতুড়ি ছেনি হাতে চার নম্বর দাঁতটার কাছে মইয়ে পা রেখে দাঁড়াল। এই মূর্তি তৈরির সময় ও পাথর কাটার কাজ করেছে। ওর অভ্যেস আছে এই ভাস্করের কাজে। ও চার সংখ্যার দাঁতটায় হাতুড়ি ছেনি চালাতে চালাতে হেসে বলল—'তোমার ধারণা এই দাঁতের খোঁদলে স্বর্ণমূর্তি আছে?'

—'ধারণা নয়, বিশ্বাস।' ফ্রান্সিস আস্তে বলল। ও একটা মশাল নিয়ে এসেছিল। সেটা মেন্তিজোর সামনে ধরে রইল। উত্তেজনায় ওর হাত কাঁপছে। নির্জন মন্দির প্রাঙ্গণে হাতুড়ি ছেনির ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ উঠছে। মেন্তিজো পাথর-দাঁত ভাঙতে লাগল। সত্যিই বোসেটা পাথর তেমন শক্ত নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দাঁত অনেকটা ভেঙে খোঁদল দেখা গেল। কিন্তু খোঁদল শূন্য। কিছু নেই তাতে। মেন্তিজো একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'পেলে কিছু?'

—'হিসেব মেলেনি। আবার ভাবতে হবে। চলো নামি।' ফ্রান্সিস মই বেয়ে নামতে লাগল। পেছনে মেন্তিজো। বিস্কো শাঙ্কো তখন নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছে ফ্রান্সিস কি সত্যিই লুকোনো স্বর্ণমূর্তি খুঁজে পেল? ফ্রান্সিস আর মেন্তিজোকে আস্তে আস্তে নামতে দেখে ওরা বুঝল ফ্রান্সিস ব্যর্থ। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারেনি।

ফ্রান্সিসরা আস্তানায় ফিরে এল। পথে কেউ কোনো কথা বলল না। ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হয়ে ফ্রান্সিস অঙ্কের সমাধান ভাবতে লাগল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিসের স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারে কথা চিকামায় ছড়িয়ে পড়ল। লোকজন বেদীর সামনে এসে ভিড় করল। দেখল দেবরক্ষীর দাঁত ভাঙা। ওরা বুঝে উঠতে পারল না মূর্তি উদ্ধার করতে দেবরক্ষীর দাঁত ভাঙা হলো কেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা বিশ্রাম করছে। রাজবাড়ি থেকে রাজার একজন দেহরক্ষী এল। ফ্রান্সিসকে কী বলল। ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। মেন্তিজোর দিকে তাকাল। মেন্তিজো বলল—'রাজা লুপাকা তোমাকে ডেকেছে।'

—'ও। ঠিক আছে। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। নইলে কেউ কারো কথা বুঝব না।' ফ্রান্সিস বলল।

মেন্তিজোও ফ্রান্সিসের সঙ্গে রাজবাড়ি চলল।

রাজা লুপাকা পাথরের সিংহাসনে বসেছিল। ফ্রান্সিস ও মেন্তিজো সামনে এসে দাঁড়াল। মেন্তিজো মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। ফ্রান্সিস মাথা নোয়াল না। এই লুপাকার আদেশেই সেদিন গায়ক তরুণটি প্রাণ হারিয়েছিল। এই বেদনা ফ্রান্সিস ভুলতে পারেনি। দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে মেন্তিজো দোভাষীর কাজ করল। রাজা ও ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা হলো এইরকম—

রাজা—'স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারবে?'

ফ্রান্সিস—'হ্যাঁ।'

রাজা—[হেসে] 'কোনোদিনই পারবে না।'

ফ্রান্সিস—'দেখা যাক। অপেক্ষা করুন।'

রাজা—'না, আমি আর অপেক্ষা করবো না। দু'দিন সময় দিলাম। হয় স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করো, নইলে আমার রাজত্ব থেকে বিদেয় হও।'

ফ্রান্সিস—'দু'দিন অনেক সময়।'

রাজা—'আর একটা কথা। শুনলাম তুমি সোনার মূর্তি খুঁজতে গিয়ে দেবরক্ষীর মূর্তির ক্ষতি করেছো। ঐ মূর্তির আর ক্ষতি করা চলবে না।'

ফ্রান্সিস—'কিন্তু ঐ মূর্তি তো আপনার চিরশত্রু রাজা কোলার হাতে তৈরি।'

রাজা—'ঐ মূর্তির নিচে আমি আমার নাম

ভাস্কর হিসেবে খোদাই করে দেব। ওটা আমার তৈরি বলে সবাই জানবে।'

ফ্রান্সিস—'বেশ। তবে একটা কথা। ঐ মূর্তির আর একটু ক্ষতি আমি করবো, কারণ প্রথমবারে আমার হিসেব মেলেনি। এটুকু আপনাকে মেনে নিতে হবে।'

রাজা—'যদি স্বর্ণমূর্তি পাই তবে এটুকু মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই।'

ফ্রান্সিসের সঙ্গে আর কোনো কথা হলো না। ওরা দু'জনে আস্তানায় ফিরে এল।

বিকেলে মারিয়া যেমন আসে এল। সঙ্গে রক্ষী দু'জন। মারিয়া ফ্রান্সিসের সেই ভেড়ার চামড়ায় লেখা অঙ্কের সংখ্যা দেখে বলল—'কী ব্যাপার তুমি কি পড়াশুনো শুরু করলে এই বুড়ো বয়সে?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'মারিয়া তুমি তো জানো—পড়াশুনার সময়টা কেটেছে আমার বিচিত্র সব অভিযানে।'

—'কী যে বল ফ্রান্সিস? তোমাদের মতো মানুষ একটা জাতির গর্ব। পড়াশুনো তোমার না হয় নাই হলো।' মারিয়া বলল।

—'আজকে কিন্তু একটু দুঃখই হচ্ছে। এই দেখ একটা সাধারণ হিসেব মেলাতে পারছি না।' ফ্রান্সিস বলল।

—'ঠিক আছে আমাকে দাও। আমি মিলিয়ে দিচ্ছি।' মারিয়া বলল। তখন ফ্রান্সিস মূর্তির কপালে উৎকীর্ণ অঙ্কের সংখ্যা, দাঁতের সংখ্যা, চার-এর পার্থক্য ধরে চার নম্বর দাঁত ভাঙা এবং কিছুই না পাওয়া —সমস্ত ব্যাপারটাই বলল। মারিয়া মন দিয়ে সব শুনল। তারপর চামড়ায় লেখা অঙ্কের সংখ্যাগুলো দেখে বলল—'ফ্রান্সিস, তুমি একভাবে হিসেব করেছো। হিসেবটা অন্যভাবেও হয়। তুমি পার্থক্য ধরেছো চার-এর। কিন্তু তিন-এর পার্থক্যটাই বোধহয় ঠিক।'

—'তাহলে তিন সংখ্যার দাঁত?

—'না। কারণ চার নম্বর দাঁতে নিশ্চয়ই খোঁদল পেয়েছো?'

—'হ্যাঁ পেয়েছি।'

—'তাহলে সেইসঙ্গে তিন সংখ্যার দাঁতের খোঁদলটাও কাছাকাছিই রয়েছে। তিন সংখ্যার দাঁতে মূর্তি লুকানো থাকলে নিশ্চয়ই তার সামান্য অংশ হলেও দেখতে পেতে। না ফ্রান্সিস তিন সংখ্যা নয়।'

—'তাহলে?' ফ্রান্সিস বেশ সমস্যায় পড়ল।

—'আচ্ছা, মূর্তির কপালে আর কোনো চিহ্ন ছিল?' মারিয়া বলল।

—'নাঃ।'

—'কিন্তু আমার মনে হয় অঙ্কের সংখ্যাগুলোর কী ভাবে হিসেব হবে, মানে যোগ হবে না বিয়োগ হবে এরকম কোনো ইঙ্গিত নিশ্চয়ই ওখানে আছে। রাজা কোলা নিশ্চয়ই কিছু চিহ্ন রেখেছেন।' মারিয়া বলল।

—'সেটা তাহলে আর একবার দেখতে হয়। তুমিও চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চলল হুয়াকার বেদীর উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছে মেস্তিজো মই বেয়ে উঠতে লাগল। ওর মনে তখনও সংশয়। মেস্তিজো মূর্তির কপালের কাছে পৌঁছল। ভালো করে দেখতে লাগল। অঙ্কগুলো ছাড়িয়ে একটু দূরে দেখা গেল অস্পষ্ট একটা চিহ্ন। এই চিহ্নটা উনকাদের ভাষায় যোগচিহ্ন। মেস্তিজো বেশ অবাক হলো। ও মনে মনে মারিয়ার বুদ্ধির প্রশংসা করল। মই বেয়ে দ্রুতই নেমে এল।

ফ্রান্সিসরা সবাই এসে ওকে ঘিরে ধরল। মেস্তিজো মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—'রাজকুমারী মারিয়া, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। অঙ্কগুলোর পরে একটা অস্পষ্ট যোগচিহ্ন আছে।' মারিয়া খুশির চোটে লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস বলল— 'কিন্তু মারিয়া এখন হিসেব করবে কী করে। চামড়া কালি কলম তো আনিনি।'

—'এই সামান্য হিসেবের জন্যে ওসবের প্রয়োজন নেই।' মারিয়া বলল। তারপর হুয়াকা দেবতার বেদীর নিচের সিঁড়িতে বসল। একটা লাল পাথরের টুকরো নিল। সব সংখ্যাগুলো লিখল। ফ্রান্সিসরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল। মারিয়া সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—'সব সংখ্যা যোগ করলে হয় চল্লিশ। কিন্তু দাঁতের সংখ্যা ষোল। হবে না। যে সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তা ষোলর কম কোনো সংখ্যা।' তারপর মরিয়া সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে নানাভাবে হিসেব করতে লাগল। কিন্তু ষোলর নিচের সংখ্যা পেল না। ও এবার ভাবল—আচ্ছা যদি প্রত্যেকটি পার্থক্যের সংখ্যাকে যোগ করি। ও বেদীর সিঁড়িতে এইভাবে লিখল—

০— ৪ = ৩
৪— ৮ = ৩
৮—১২ = ৩
১২—১৬ = ৩

নিচে টান দিয়ে লিখল— ১২

ফ্রান্সিস বলল—'তিন সংখ্যা কীভাবে পেলে।'

মারিয়া বলল—'শূন্য থেকে প্রত্যেকটি সংখ্যা বাদ দিলে পার্থক্য হয় ৩ অঙ্কের। যেমন শূন্য বাদ—১ ২ ৩ = ৩ সংখ্যা। তেমনি ৪ বাদ — ৫ ৬ ৭ = ৩ সংখ্যা। এভাবে পার্থক্যগুলো যোগ করেই পাই—১২ সংখ্যা।

মারিয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে ফেলল। চেঁচিয়ে বলল—'ফ্রান্সিস, বারো সংখ্যার দাঁত।

ফ্রান্সিস ডাকল—'মেস্তিজো, হাতুড়ি ছেনি নিয়ে চলো।'

দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। মূর্তির মুখের কাছে এসে দু'জনে দাঁড়াল। বিকেলের সূর্যের লালচে আলো পড়েছে মূর্তিটায়। ওদিকে নিচের প্রাঙ্গণে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। অবাক চোখে দেখছে ফ্রান্সিসদের কাণ্ড। নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। হয়তো মূর্তিটা এভাবে নষ্ট করছে ভিনদেশীরা— এটা ওদের পছন্দ নয়।

মেস্তিজো দাঁতের ওপরের পাটি থেকে গুনে বারো সংখ্যার দাঁতে হাতুড়ি ছেনি চালাল। বারকয়েক হাতুড়ি ঠুকে ছেনি চালাতেই দাঁতের সামনের পাথরের আস্তরণ খুলে এল। দেখা গেল হুয়াকা দেবতার সেই আসল স্বর্ণমূর্তি। খোঁদলে বসানো। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে সেই মূর্তির চোখে মুখে গায়ে। ঝিকিয়ে উঠছে মূর্তির গা, দুচোখে নীলকান্ত মণি, মাথায় কারুকাজ করা মুকুট, গায়ের অলঙ্কার। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে দেখতে লাগল মূর্তিটা। একটু পরে ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো, আমি বিধর্মী। তোমাদের দেবমূর্তির গায়ে হাত দেব না। তুমি একা মূর্তিটা নিয়ে নামতে পারবে?'

—'পারবো। কাঁধে নিয়ে নামবো।' কথাটা বলে মেস্তিজো প্রথমে স্বর্ণমূর্তির সামনে কিছুক্ষণ মাথা নত করে রইল। মুখে বিড়বিড় করে কী বলল। তারপর মূর্তিটা খোঁদল থেকে বের করে কাঁধে তুলে নিল। এবার নিচে দাঁড়ানো চিকামার অধিবাসীরা মূর্তিটা দেখতে পেল। সবাই নিঃশব্দে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মাথা নুইয়ে রইল। চারদিকে এত লোক। কোনো শব্দ নেই কারো মুখে।

প্রথমে ফ্রান্সিস মই থেকে নেমে এল। বিস্কো আর শাঙ্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—'কৃতিত্ব আমার নয়, মারিয়ার। ওর অঙ্কের হিসেব ছিল নির্ভুল। মারিয়াও হেসে বলল—'কিন্তু সন্ধানের সূত্র তুমিই দিয়েছিলে। সব কৃতিত্ব তোমার।' ফ্রান্সিস হাসল। কোনো কথা বলল না।

মেস্তিজো স্বর্ণমূর্তি কাঁধে নিয়ে মই থেকে নামল। ফ্রান্সিসকে বলল—'এই মূর্তি নিয়ে কী করবো এখন?'

—'তোমাদের দেবতা, সেটা তোমাদের ব্যাপার। আমার কাজ ছিল মূর্তি উদ্ধার, তা আমি করে দিয়েছি। এখন আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'স্বর্ণমূর্তিটা তোমরাই নিয়ে যাও না। রাজা লুপাকার হাতে পড়লে ও হয় মূর্তিটা গালিয়ে ফেলবে নয় তো নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবে।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস হেসে মাথা নেড়ে বলল—'স্বর্ণমূর্তির ওপর আমাদের কোনো লোভ নেই। তোমাদের উপাস্য দেবতার মূর্তি। তোমাদেরই থাকবে।'

ওদিকে রাজা লুপাকার কাছে মূর্তি উদ্ধারের খবর পৌঁছে গিয়েছিল। রাজা লুপাকা ছোট পাহাড়ি ঘোড়ায় চেপে ছুটে এলো।

মেস্তিজোর কাঁধে আসল মূর্তি দেখে রাজা খুব খুশি। ফ্রান্সিস রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। মেস্তিজোকে ইঙ্গিত করল ওর কথাগুলো রাজাকে বুঝিয়ে দিতে। ফ্রান্সিস মেস্তিজো মারফৎ বলল—'রাজা লুপাকা আমি কথা রেখেছি। আপনাদের দেবমূর্তি উদ্ধার করে দিয়েছি। এবার আমার দু'টো অনুরোধ জানাচ্ছি—আশাকরি আপনি রাখবেন।'

রাজা লুপাকা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বলল —'এক ঃ দেবমূর্তি আপনি আপনার দেশে নিয়ে যাবেন না। চিকামাতে এই বেদীতেই মূর্তিটা রাখবেন। দুই ঃ মেস্তিজোকেই এই দেবমূর্তির পূজারী হিসেবে আবার বহাল করবেন। অন্য কাউকে নয়।' রাজা লুপাকা মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে বললেন—'ঠিক আছে। তাই হবে।'

ফ্রান্সিস এবার মেস্তিজোর দিকে তাকাল। বলল—'মেস্তিজো, মূর্তি বেদীতে রেখে তুমি চলো আমাদের পথ দেখিয়ে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাবে।'

মেস্তিজো স্বর্ণমূর্তিটা কাঁধে নিয়ে বেদীতে উঠল। কাঠের মূর্তির পাশে রাখল। মাথা নুইয়ে ভক্তি জানিয়ে নেমে এল। ততক্ষণে মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া উনকারা আনন্দে নাচানাচি শুরু করেছে। রাজা লুপাকাও খুশি।

সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মেস্তিজো। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসরা দেখল চিকামাবাসীরা দলে দলে হুয়াকা দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে চলেছে। হাতে তাদের ফুলপাতা। আনন্দে হাসছে ওরা। এতদিন পরে আসল স্বর্ণমূর্তি পাওয়া গেছে। ফ্রান্সিস এই ভেবে খুশি হলো। এতগুলো মানুষের মুখে ও হাসি ফোটাতে পেরেছে।

মরুভূমির পথ নয়। অন্য পাহাড়ি পথে মেস্তিজো কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ওদের সমুদ্রতীরে পৌঁছে দিল। জাহাজে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস ডাকল—'মারিয়া।'

—'বলো।'

—'এবারও আমাদের হাত শূন্য।' ফ্রান্সিস বলল।

—'তাহোক। এজন্যে আমার মনে কোনো দুঃখ নেই,' মারিয়া বলল।

ছবি ঃ প্রসাদ রায়



সমাপ্ত